বরণীয় যাঁরা

মৃণাল কান্তি দাশগুপ্ত

বোর্ডের সিলেবাস অনুসারে পঞ্চম শ্রেণীর দ্রুত-পঠনের জন্য লিখিত

বরণীয় যাঁরা

সবার মা সারদা, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বিজয়ানন্দ, ছোটদের রামকৃষ্ণ
ছোটদের সাধক, মুক্তপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ, যুগবিপ্লবী বিবেকানন্দ
বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়া, বিপ্লব সাধনায় নিবেদিতা, ভারতে
নিবেদিতা, রূপ হ'তে অরূপে, যুগদেবতা শ্রীশ্রীরাম-
ঠাকুর ও অন্যান্য উচ্চ প্রশংসিত গ্রন্থসমূহের
প্রণেতা সুসাহিত্যিক

শ্রীমৃণাল কান্তি দাশগুপ্ত

প্রাপ্তিস্থান :
দেবেন্দ্র গ্রন্থালয়
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
কৃষ্ণপ্রিয় দাশগুপ্ত
॥ যামিনী প্রভা প্রকাশন ॥
১৮২, বি, বি, গাঙ্গুলি ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ শিল্পী :
শ্রীসুধীর বাগ্‌চী

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৬৪
পুনর্মুদ্রণ : ১৯৭৫
" : ১৯৭৮
পরিমার্জিত সংস্করণ-১৯৮৬

মূল্য : পাঁচ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :
সাধন চক্রবর্ত্তী
নবীন প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৩, কার্ত্তিক বোস ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

সূচীপত্র

বুদ্ধদেব

একটি কিশোর বালক। রাজপুত্র। ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম। কিন্তু কোমল প্রাণ। পশুপক্ষী-কীটপতঙ্গ ও মানুষের দুঃখকষ্টে এই বালক স্থির থাকতে পারত না।

একদিন একটি ঘটনা ঘটলো। এই বালক বসে আছে উপবনে একলাটি। তার পায়ের কাছে এসে হঠাৎ পড়ল একটি পাখী। পাখীটি তীক্ষ্ণশরে বিদ্ধ হয়েছে। কি তার পাখার ঝটপটি! রক্ত গড়িয়ে পড়ছে তার ক্ষতস্থান থেকে।

এ করুণ দৃশ্য দেখে বালকের প্রাণ কেঁদে উঠল। কত দরদ দিয়ে সে শরমুক্ত করল পাখীটিকে। ঝরণার জলে ধুয়ে মুছে ক্ষতস্থানে প্রলেপ লাগিয়ে দিল বালক। ব্যথায় চুপচাপ পড়ে রইল পাখীটি।

বালকের সেবাযত্নে পাখীটি চোখ খুলে চাইল। ভীতি-বিহ্বল তার দৃষ্টি। কে এমন নিষ্ঠুর কাজ করল? সে এই বালকেরই এক খেলার সাথী। খেলার সাথীটি এসে দাবী করল পাখীটিকে। কিন্তু রাজপুত্র খেলার সাথীকে বলল, তুমিতো পাখীর

প্রাণ নাশ করতে চেয়েছিলে, কাজেই ওকে তুমি দাবী করতে পার না। ওর প্রাণ আমি রক্ষা করেছি, তাই ওর উপর অধিকার আমার।

খেলার সাথীটি উদ্ধত, নির্মম। সে দাবী ছাড়বে না। পাখীটিকে সে হত্যা করবেই।

অধিকারের প্রশ্নের মীমাংসা হ'ল। মীমাংসা করলেন রাজ-পুরোহিত। তিনি প্রাণদাতার দাবী স্বীকার করলেন।

কে এই প্রাণদাতা বালক ?

শোন—

আজ হতে প্রায় ছাব্বিশ শত বর্ষ পূর্বে—এক প্রসন্ন প্রভাত। হিমালয়ের পাদদেশে তরাই অঞ্চলে অবস্থিত কপিলাবস্তু নগর। সেকালের রাজা শুদ্ধোদনকে তাঁর রাণী মায়াদেবী বলছেন এক স্বপ্ন বৃত্তান্ত। রাণী স্বপ্নে দেখেছেন—আকাশের বুক থেকে নেমে আসছে একটি ছোট্ট শ্বেত হস্তী। নামতে নামতে এসে নামল রাণীর কোলে। তারপর স্বপ্ন গেল ভেঙ্গে।

রাজা শুনে দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করলেন। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। আনন্দ-বেদনা-মিশ্রিত ভাব রাজার। ডাকলেন মৌহূর্ত্তিকদের অর্থাৎ রাজজ্যোতিষীদের। তাঁরা রাণীর স্বপ্ন ব্যাখ্যা করলেন। রাণীর কোলে আসছেন এক মহামানব। 'ঐ মহামানব আসে।'

৫৬৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। এক বৈশাখী পূর্ণিমা। রাত্রিতে জোছনার ঢল নেমেছে পৃথিবীর বুকে। ফুটফুটে রাত্রি। মায়াদেবী

চলেছেন পিত্রালয়ে। সংগে তার সংগিণীরা। যেতে যেতে রাজার লুম্বিনী কাননে থামলেন রাণী। মহামানব এলেন, এলেন রাণীর কোলে। রাণীর স্বপ্ন সার্থক হ'ল। জন্ম নিলেন বুদ্ধদেব। উৎসব আনন্দে মুখর হয়ে উঠল কপিলাবস্তু।

বুদ্ধদেবের বাল্যকালে নাম সিদ্ধার্থ। গৌতম বলেও তিনি পরিচিত। তাঁর জন্মের কয়েকদিন পরেই তিনি মাতৃহারা হন। আনন্দের মধ্যে নেমে এল বিষাদ। কে পালন করবে নবজাতককে! শোকার্ত্ত রাজার দুর্ভাবনার অন্ত নেই।

শুদ্ধোদনের আর এক রাণী গৌতমী। আনন্দে এই বিমাতা গ্রহণ করলেন সিদ্ধার্থের ভার। প্রাণঢালা স্নেহ দিয়ে লালন-পালন করতে লাগিলেন শিশুকে।

রাজপুরীতে এলেন জটাজুটধারী সন্ন্যাসী। ভবিষ্যদ্বাণী করলেন তিনি—এ জাতক উত্তরকালে হবে এক বিরাট ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। এতো ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ!

বাল্যকালেই সিদ্ধার্থের প্রাণ কাঁদত জীবের দুঃখে। পশু-পক্ষীর দুঃখ, মানুষের দুঃখ সমানভাবে তাঁকে ব্যথা দিত। মানুষের রোগ ব্যাধি জরা মৃত্যু দেখে সিদ্ধার্থ কেমন যেন আনমনা হয়ে যেতেন। ভাবতেন—ব্যাধি জরা মৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতি কি নেই? রাজার ঐশ্বর্য, প্রতিপত্তি, আরাম, বিলাস তাঁর ভাল লাগত না। পিতা পুত্রের বৈরাগ্য দেখে চিন্তিত হলেন। জ্যোতিষীদের কথা তাঁর স্মরণ হ'ল। স্মরণ হল সন্ন্যাসীর ভবিষ্যদ্বাণী।

উদাসীন সিদ্ধার্থকে শুদ্ধোদন ঘটা করে বিয়ে করালেন। যশোধরাকে পুত্রবধূ করে আনলেন রাজা। রূপে যশোধরা ছিলেন অতুলনীয়া।

দশ বছর কেটে গেল। সিদ্ধার্থ একটি পুত্রসন্তান লাভ করলেন। পুত্রের নাম রাহুল।

কিন্তু স্বস্তি নেই, তৃপ্তি নেই সিদ্ধার্থের। মোহমুক্ত হবার জন্য তিনি উতলা হলেন। জীবের মুক্তিসাধনের পথে কোন বন্ধন ক্রন্দনকেই স্বীকার করতে চাইল না তাঁর মন। তিনি গৃহত্যাগের সংকল্প করলেন।

এই সংকল্পের কথা বললেন স্ত্রীকে। তিনি তো কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। পিতাকে নিবেদন করলেন সিদ্ধার্থ তাঁর গৃহত্যাগের সংকল্প। বৃদ্ধ রাজার অন্তর হাহাকার করে উঠল। কিন্তু মানুষের দুঃখ, বিশ্বের দুঃখমোচনে বদ্ধপরিকর সিদ্ধার্থ। জরা ব্যাধি মৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতির পথ যে তাঁকে পেতেই হবে।

উনত্রিশ বর্ষে সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করলেন। 'রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা বিষয়ে বিরাগী।' রাজপুরী ঢেকে গেল বিষাদের ছায়ায়।

সিদ্ধার্থ উপনীত হলেন বৈশালীনগরে। সেখানে তিনি অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন। বৈশালীর প্রবীণ সাধক আচার্য আলাড়। তাঁর কাছে কিছুকাল বাস করলেন সিদ্ধার্থ। শিক্ষা করলেন ধ্যান ধারণার নানা প্রণালী। কিছুকাল সাধন ভজন করলেন সেখানে। কিন্তু সিদ্ধার্থের মন তৃপ্ত হ'ল না।

তারপর সিদ্ধার্থ চলে গেলেন রাজগৃহের উপকণ্ঠে পাণ্ডব পাহাড়ের গুহায়। সেখানে শুরু হ'ল তাঁর সাধনা।

মাঝে মাঝে সিদ্ধার্থ নগরে যেতেন ভিক্ষা করতে। একদিন তাঁকে দেখলেন রাজা বিম্বিসার। দেখে বিমুগ্ধ হলেন রাজা। প্রাসাদে বরণ করতে চাইলেন সিদ্ধার্থকে আচার্য রূপে। কিন্তু বিশ্বমানবের মুক্তির সন্ধানী রাজপ্রাসাদে ফিরে যাবেন কেন?

কৃচ্ছ্রসাধনা চলল সিদ্ধার্থের একটানা কয়েক বছর ধ'রে। দেহ অস্থিচর্ম্মসার হল! কিন্তু কোথায় শান্তি, কোথায় পথ?

কঠোর তপস্যা ত্যাগ করে এবার সিদ্ধার্থ মধ্যপন্থা অবলম্বন করলেন। দেহরক্ষার জন্য তিনি তখন কিছু কিছু আহার ও পানীয় গ্রহণ করতে লাগলেন।

এই সময় একদিন সিদ্ধার্থ নৈরঞ্জনায় স্নান সমাপনান্তে এক অশ্বত্থবৃক্ষমূলে ধ্যানমগ্ন হয়ে রইলেন। বণিগ্‌বধূ সুজাতা সেখানে উপনীত হলেন বনদেবতার পূজার জন্য। হাতে তাঁর পূজার উপচার ও পরমান্ন।

সিদ্ধার্থের দিব্যমূর্তি দেখে বিমুগ্ধাত্মা বণিগ্‌বধূ। তাঁকেই তিনি বনদেবতার জাগ্রত প্রতীক বলে নিবেদন করলেন পূজা ও পরমান্ন। গ্রহণ করলেন সিদ্ধার্থ।

নৈরঞ্জনার তীরে বোধিদ্রুম মূলেই সিদ্ধার্থের অন্তর উদ্ভাসিত হ'ল পরমজ্ঞান ও সত্যের শুভ্রালোকে। তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করলেন। পরিচিত হলেন সিদ্ধার্থ বুদ্ধ নামে।

ভোগও নয়, কাঠোর তপশ্চর্যাও নয়—এ দুয়ের মধ্য পথই শ্রেষ্ঠ পথ বলে নির্দ্দেশ দেন বুদ্ধদেব। তিনি মানুষের মুক্তির জন্য, নির্বাণের জন্য আটটি পথের—সম্যগ্ দৃষ্টি, সদ্বাক্য, সৎকার্য্য, সৎ-সংকল্প, সৎজীবন, সৎচেষ্টা, সৎস্মৃতি ও সম্যক সমাধির—সন্ধান দেন।

ধর্মকে তিনি আড়ম্বরমুক্ত করলেন। যাগযজ্ঞ, পশুবলি নিষেধ করেন। অহিংসাই পরমধর্ম। তিনি জাতিভেদ মানতেন না। মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই। ধনী, দরিদ্র, উচ্চনীচ সকল মানুষই তাঁর ধর্মের আশ্রয় লাভে ধন্য হল। শুধু ভারতবর্ষের মানুষ নয়, সারা বিশ্বে বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়ল।

বুদ্ধদেব প্রথম তাঁর ধর্ম প্রচার করেন বারাণসীর নিকটবর্তী সারনাথে। তাঁর আদি শিষ্যদের মধ্যে বিম্বিসার, অনাথপিণ্ডদ্, সারিপুত্ত, মগ্গালন, আনন্দ ও উপালি-র নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি অনেক সংঘ স্থাপন করেছিলেন।

আশী বৎসর বয়সে উপনীত হয়েছেন বুদ্ধদেব। কুশীনগরের শাল-বনে শত শত ভিক্ষু ও গৃহস্থের ভীড়। চোখে মুখে আশংকা উদ্বেগের ম্লানিমা। আনন্দ আকুল, তাঁর অন্তর আসন্ন বিয়োগ ব্যথায় কল্লোলিত। সমাগত শিষ্য ভক্তদের বুদ্ধদেব ত্যাগতিতিক্ষাধন্য জীবন যাপন করতে ও নির্বাণলাভের চেষ্টা করতে শেষবারের মত উপদেশ দিলেন। রাত্রি তৃতীয় যামে তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হ'ল।

অনুশীলনী

১। বুদ্ধদেবের মা ও বাবার নাম কি? তিনি কোথায় জন্মেছিলেন?

২। বুদ্ধদেব আহত কাকে সেবাযত্ন করেছিলেন? ওটাকে কে আহত করেছিল এবং সে বুদ্ধদেবের কাছে কি দাবী করেছিল?

৩। বুদ্ধদেব কত বছর বয়সে বিয়ে করেছিলেন এবং কাকে বিয়ে করেছিলেন?

৪। বুদ্ধদেব কত বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করেছিলেন এবং কোথায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন? কে তাকে পূজা ও পরমান্ন নিবেদন করেছিল।

৫। বুদ্ধদেবের কয়েকজন প্রধান শিষ্যের নাম কর।

৬। বুদ্ধদেবের নির্বাণের কয়টি পথ নির্দেশ করেন? সেগুলোর নাম কর।

যিশুখৃস্ট

এশিয়ায় যেমন এসেছিলেন বুদ্ধদেব, ঠিক তেমনি পশ্চিম দেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন আর একজন মহাপুরুষ।

কি নাম তাঁর জান?

যিশুখৃষ্ট।

বুদ্ধদেব করেছেন তখন নির্বাণ লাভ। অতীত হয়ে গিয়েছে প্রায় পাঁচশত বছর। পশ্চিমের দিগন্তে উদয়ন হল এক নবারুণের। বিস্ময় ভরে মানুষ তাকিয়ে দেখল তাদের আপন জনের আবির্ভাব লগন। অদ্ভুত সে কাহিনী। অলৌকিক সে পুণ্য মুহূর্ত। শোন, বলছি—

জুডিয়া নামে ছিল একটি রাজ্য। বসবাস ছিল সেখানে ইহুদিদের। জুডিয়ারই এক অংশের নাম গ্যালিলি। গ্যালিলির অন্তর্গত নাজারেথ নামক একটি শহর। সেখানে বাস করেন দরিদ্র এক ছুতার। কি নাম তাঁর বল তো? জোসেফ।

জোসেফের স্ত্রীর নাম মেরী।

দুজনের একটি ছোট সংসার। অভাব, অনটন, অনাহার তাঁদের নিত্য সঙ্গী। তাই বলে একটুও বেদনা নেই। বিরক্তি নেই। নেই সৎ চিন্তা, সৎ ভাবনার বিন্দুমাত্র অভাব।

কর্ম-ক্লান্ত জোসেফ দিনান্তে যা ঘরেনিয়ে ফেরেন, তাই দিয়েই মেরী হাসি মুখে করেন ক্ষুন্নিবৃত্তি। এমন করেই দিনগুলো কাটছিল তাঁদের।

একবার তাঁরা মনে করলেন, নাজারেথ ছেড়ে চলে আসবেন অন্য শহরে। তাই এসে উপনীত হলেন। বেথেলহেমে। শহরে তখন হৈ হৈ কাণ্ড। হচ্ছিল লোকগণনার কাজ। তাই বহু দূর গ্রামের লোকেরা এসে উপস্থিত হল শহরে। কোথায় কে থাকবে? তিল ধারণের ঠাঁই নেই। হোটেল, সরাইখানা সব ভর্তি। বড় চিন্তায় পড়লেন জোসেফ। অন্তসত্ত্বা মেরীকে নিয়ে কোথায় উঠবেন তিনি। অবশেষে অনেক ঘোরাঘুরির পরে ঠাঁই নিলেন এক ঘোড়ার আস্তাবলে।

রাত, গভীর রাত।

ক্লান্ত জোসেফ। ঘুমিয়ে পড়েছেন তিনি। কিন্তু মেরী? তাঁর চোখে ঘুম নেই। তিনি বেদনায় ক্লিষ্ট। কণ্ঠে তাঁর কাতরিমার কান্না। সহসা জোসেফ সজাগ হয়ে গেলেন। কি বিপদ। এ রাত্রে তিনি কোথায় যাবেন মেরীকে নিয়ে। না, আর সময় নেই। উপায়ও খুঁজে কিছু পেলেন না। স্মরণ করলেন বিপদের বন্ধু ঈশ্বরকে। কাতর ভাবে জানালেন তাঁদের অন্তরের আর্তি।

যাঁর কেউ নেই তাঁর তিনি আছেন। জোসেফ এবং মেরীর ক্রন্দনে সাড়া দিলেন তিনি। বিদুরের ঘরে যেমন ক্ষুদ কুড়া খেতে এসেছিলেন ভগবান, ঠিক তেমনি দরিদ্র মা বাবার ঘরে আবির্ভূত হলেন যিশু। রাত্রিও তখন শেষ হয়ে এসেছিল। হয়তো ওঁদের

দুঃখের রাত্রিও এবারে প্রত্যুষের প্রাকলগ্নে। না, কোনো আয়োজন নেই। কোনো উৎসব নেই। অতি নগণ্য একটি পরিবেশে দয়া করে এলেন দীনের বন্ধু মানবের প্রাণপ্রতীম এক মহাপুরুষ।

যিশুর জন্ম সম্বন্ধে শোনা যায় এক অলৌকিক কাহিনী। পারস্য দেশের কয়েকজন পণ্ডিত বসলেন একদিন গণনা করতে। এলেন এক অপূর্ব সিদ্ধান্তে। তাঁরা দেখলেন পৃথিবীতে শীঘ্রই আসছেন একজন শক্তিশালী মহাপুরুষ। শুধু কি কেবল তাই? আরও দেখলেন। কি? যেখানে তিনি জন্মগ্রহণ করবেন, সে দেশের আকাশে উঠবে একটি উজ্জ্বল তারা। তার দীপ্তি থাকবে অন্য সব তারার চেয়ে অনেকগুণ বেশী। পণ্ডিতেরা ছিলেন তখন জুডিয়ার রাজধানী জেরুজালেমে। হঠাৎ তাঁরা চমকে উঠলেন। দেখতে পেলেন আকাশের পটে সেই বহু প্রতীক্ষিত তারাটি।

আকুল প্রাণে ব্যাকুল হয়ে ছুটলেন তাঁরা, ছুটলেন পথে পথে সেই শিশুর সন্ধানে। কোথায় পাবেন তাঁরে? ধ্রুব করলেন সেই তারাটি। ত্রস্ত পদবিক্ষেপে অতিক্রম করতে লাগলেন দুর্গমের দিগন্ত। অনুরাগের বেণুধ্বনি শোনার জন্য ভগবান আসেন কান পেতে। ওঁরা ঠিক চলে এলেন বেথেলহেমে। দর্শন পেলেন মা মেরীর কোলে সেই অপূর্ব দেব-শিশুর। অবাক বিস্ময়ে অপলক নয়নে তাকিয়ে রইলেন। জানালেন প্রণাম। মন বলে উঠল—ইনিই সেই দেবশিশু। ইনিই ইহুদি জাতির ত্রাণকর্তা।

লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল সংবাদ। দলে দলে ইহুদিরা দেখতে আসল তাদের প্রাণের মানুষটিকে। তাদের মনে অশেষ

আশা ও আনন্দ। আর ভয় নেই। তিনি এসেছেন দুঃখের দিন, বেদনার দিন আর কান্নার দিনের অবসান ঘটাতে। ত্রাণকর্তা এসেছেন দুঃখী জনের চোখের জল মোছাতে।

আনন্দের সংবাদ। সুখের সংবাদ। এ সংবাদ রাজা হেরডের কানে তুলতে এগিয়ে গেলেন কয়েকজন সাধুপুরুষ। তাঁরা বললেন রাজাকে ভগবানের প্রিয় সন্তান এসেছেন। তিনি হবেন রাজার রাজা।

নীরবে শুনলেন সংবাদটি রাজা হেরড। বললেন না কিছু মুখে। কিন্তু মনে মনে পেলেন ভয়। তিনি রাজ্যের দিকে দিকে লোক পাঠালেন। বললেন যেখানে যত শিশু দেখবে, হত্যা করবে। হেরডের রাজ্যে চলল শিশু হত্যার যজ্ঞ।

সংবাদটি ভেসে এল জোসেফের কানে। তিনি মেরীকে নিয়ে হেরডের রাজ্য ছেড়ে চলে গেলেন মিশরে।

নিষ্ঠুর হেরড পশু প্রবৃত্তির তাড়নায় যিশুভ্রমে বহু শিশুকে ফেললেন হত্যা করে। কিন্তু পাপের আগুন দাউ দাউ করে জ্বললেও অচিরেই তা স্তিমিত হয়ে আসে। কিছু দিনের মধ্যেই রাজা হেরড়ের মৃত্যু হল। জোসেফ ও মেরী আবার ফিরে এলেন নাজারেথে।

তখনকার দিনের জেরুজালেম ছিল ইহুদিদের পরম তীর্থস্থান। প্রত্যেক বছরে সেই পবিত্র তীর্থে হত বহু ইহুদির সমাগম। জ্ঞানী গুণী সাধু মহাপুরুষদের আবির্ভাব ঘটত সেখানে। সে উৎসবে জোসেফ ও মেরী তাঁদের পুত্র সন্তানটিকে নিয়ে হলেন উপস্থিত। কিন্তু ঘটল অনর্থ। পণ্ডিতদের আসরে বসে বালক যিশু শুরু করলেন

ধর্মালোচনা। বাবা-মা ভীত হলেন। তাঁরা ভাবলেন—ছেলের নিশ্চিত মাথা খারাপ হয়েছে। তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে ফিরে এলেন গ্রামে। কিন্তু কি হবে তাতে? অমৃতের সন্ধান দিতেই তো তিনি এসেছেন। তাই উঠলেন আরো মুখর হয়ে। দীন, দরিদ্র, দুঃখী, চাষী মজুরের সঙ্গী হয়ে উঠলেন তিনি। দিন রাত পড়ে থাকতেন তাদের সঙ্গে। ভিক্ষুকদের সাথে সাথে পথে পথে করেন তিনি ভিক্ষা। প্রতিবেশীদের শোনাতেন তাঁর অমৃতময় বাণী—ঝগড়া ক'রো না। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে কাউকে আঘাতের বদলে আঘাত ক'রো না। ক্ষমা ক'রো। ভালবাসা দিও।

কিন্তু তখনকার দিনের পণ্ডিত ও পুরোহিতগণ পারলেন না যিশুকে সহ্য করতে। তাঁরা মনে মনে হলেন ভীত। উপরে বললেন যিশু পাগল। এ আপদকে বিদায় কর।

এমনি দিনে কিছুকালের জন্য যিশু হলেন নিখোঁজ। মগ্ন হলেন গভীর ধ্যানে। লাভ করলেন সিদ্ধি। শোনাতে লাগলেন মানুষকে তাঁর চিরন্তন বাণী—"জীবনে করবে না কোনো পাপ কাজ। মিথ্যা কথা বলবে না। পিতা মাতাকে ভক্তি করবে। লোভ হিংসা ত্যাগ করবে। অন্যায় করলে ভগবানের কাছে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করবে। আমরা সবাই ভগবানের সন্তান।"

এবার ধীরে ধীরে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল ছুতার মিস্ত্রীর পুত্রের সংবাদ। পুরোহিত এবং পণ্ডিতেরা এবারে আর পারলেন না ধৈর্যের বাঁধ রাখতে। উঠলেন ক্ষিপ্ত হয়ে। কিন্তু কি হবে তাতে। ক্রমে প্রকাশিত হয়ে পড়তে লাগল মহামানবের যোগ বিভূতি। তাঁর স্পর্শ প্রার্থনায় আতুর আকুতি নিয়ে ছুটে আসতে লাগল দূর দূর থেকে

কত অন্ধ। কত পঙ্গু। প্রেমপুরুষ যিশুর আশীর্বাদে তারা ফিরে পেল নবজীবন। পঙ্গু লঙ্ঘন করল গিরি। অন্ধ দেখল পৃথিবীর আলো।

দল বেঁধে অসৎ মানুষেরা নানাভাবে অপমান করতে লাগলেন যিশুকে। কিন্তু সূর্যকে ঢেকে রাখতে কে পেরেছিল কবে? আর কোনো উপায় না পেয়ে তাঁরা যিশুর নামে নালিশ জানালেন রোমান শাসকের কাছে। রাজাও হয়ে গেলেন কুচক্রিদের দলভুক্ত। যিশুর বিরুদ্ধে আনা হল রাজদ্রোহের অভিযোগ। দেওয়া হল তাঁকে দণ্ড। রোমান সৈন্যদের আদেশ দেওয়া হল—যিশুকে অপরাধের শাস্তি স্বরূপ ক্রুশবিদ্ধ কর। তারা যিশুর হাতে পায়ে লোহা বিঁধে দিল। ঝর ঝর করে পড়তে লাগল রক্ত। মানব-বন্ধু প্রেমাবতার যিশুর কণ্ঠ থেকে শুধু শোনা গেল—ভগবান ওরা অবুঝ। তুমি ওদের ক্ষমা ক'রো।

ধীরে ধীরে নির্বাপিত হয়ে গেল তাঁর জীবন-দীপ। ইহুদিদের বহু প্রতীক্ষিত, বহু আকাঙ্খিত দেবতা বিদায় নিলেন। কিন্তু রেখে গেলেন তার শাশ্বত বাণী। তাই দিয়ে রচিত হল বাইবেল। খৃষ্টানদের অতি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ।

এই গ্রন্থটিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ওল্ড টেষ্টামেণ্ট নামে অভিহিত হল প্রথম খণ্ড। দ্বিতীয় খণ্ডের নাম নেওয়া হল নিউ টেষ্টামেণ্ট। এই পুস্তকের মধ্যে লিখিত রয়েছে যিশুর জীবনী ও বাণী।

অনুশীলনী

১। যিশুখৃস্ট কোথায় জন্মেছিলেন? তার মা বাবার নাম কি?

২। যিশুর জন্ম সম্বন্ধে কি অলৌকিক কাহিনী শোনা যায়?
৩। যিশুখৃস্টের জন্মের সংবাদটি শুনে রাজা হেরড কি করলেন? রাজা মারা গেলে জোসেপ এবং মেরী কি করলেন?
৪। পুরোহিতেরা এবং পণ্ডিতেরা ক্ষেপে উঠলেন কেন? যিশুর বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আনা হয়েছিল এবং তার ফলে কি হয়েছিল?
৫। যিশুর বাণী কোথায় লিপিবদ্ধ আছে? ওটা কি খৃস্টানদের ধর্মগ্রন্থ? ওটার কয়টা অংশ ও কি কি?

হজরত মোহম্মদ

আজ থেকে প্রায় চৌদ্দশত বছর আগেকার কথা বলছি। আরবদেশ তখন পাপে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। দেখা দিয়েছিল মানুষে মানুষে বিভেদ। দাস ব্যবসায় লিপ্ত হয়ে পড়ল তারা। মানুষ মানুষকে করতে লাগল ঘৃণা। কু অভ্যাস, কু প্রথায় সমাজ-জীবন অতিষ্ঠ। আরবের লোকেরা পুতুল পূজা করতে গিয়ে জীবহত্যায় মত্ত হয়ে উঠল। একে অপরকে হিংসা করে। নানা জাতি, নানা উপজাতির মধ্যে নিত্য দ্বন্দ্ব, নিত্য সংঘাত লেগেই থাকে। অনেক দেবতার উপাসক তারা। কাজেই অনেক দ্বন্দ্ব সেখানে। এদের মধ্যেই যারা সৎ সুন্দর মহৎ তারা নিভৃতে কাঁদে। প্রার্থনা করে আল্লাহ্‌র দোয়া।

আরবদেশের সবচেয়ে বড় শহরের নাম মক্কা। সেখানে ছিল তাদের দেবতার একটি বিরাট মন্দির। মন্দিরের ভেতর ছিল একটি

বেদী। বেদীর চারটি কোণ ছিল কালো পাথরের তৈরী। একে ওরা বলত—কাবা। এই কাবাকে পূজা করত বেদুইনরা। সেই পূজার দিনে মক্কায় অনুষ্ঠিত হত বিরাট উৎসব। ধর্মকে কেন্দ্র করে চলত নানা অনাচার, অত্যাচার। ব্যভিচারের বন্যায় গা ভাসিয়ে দিত তারা। আর তাতে প্রধান অংশগ্রহণ করত মক্কার সুবিখ্যাত কোরেশ বংশ। তাঁদের খ্যাতি তখন মক্কার আকাশে বাতাসে সুবিদিত।

এমনি এক চরম সঙ্কট মুহূর্তে আরবদেশে আবির্ভূত হলেন হজরত মোহম্মদ। আরবদের ধর্মের ইতিহাসে তিনিই প্রবর্তন করেন পবিত্র ইস্‌লামের বাণী।

৫৭১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মক্কার বিখ্যাত কোরেশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তাঁর পিতার নাম ছিল আবদুল্লাহ। মাতার নাম আমিনা।

বড় দুঃখী ছিলেন বাল্যজীবনে হজরত। বাবার মৃত্যু হয় তাঁর জন্মাবার আগেই। মাও মারা যান তাঁর জন্মের কয়েক মাসের মধ্যেই। বাবা মা দুজনেই চলে গেলেন। হজরত অসহায়। যেন তাঁর চতুর্দিক শূন্য। কেউ নেই। ঠাকুরদা টেনে নিলেন বুকের মধ্যে। চোখ মুছিয়ে দিলেন। ধীরে ধীরে অতিক্রান্ত হতে লাগল দুঃখের দিনগুলো। ঠাকুরদা আর কাকা। এই তো তার সঙ্গী। হজরতের লালন রক্ষণের দায় দায়িত্বও তাদেরই। কিন্তু মাঝে মাঝেই বড় একা লাগে তাঁর। মনটা যায় উদাস হয়ে। একাকী বসে থাকেন। কি যেন ভাবেন। কোথায় যেন হারিয়ে যান।

সেকালে লেখাপড়ার তেমন চর্চা ছিল না লোকেদের মধ্যে। তাই

হজরত পুঁথিগত বিদ্যা লাভ থেকে এক রকম বঞ্চিতই রইলেন। কেবল অক্ষর-জ্ঞান বলতে যা, তাই হয়েছিল মাত্র। কিন্তু তাঁর ভেতর দুয়ার গিয়েছিল খুলে। তিনি ধীরে ধীরে দিব্যজ্ঞানের স্পর্শে আলোকিত হতে লাগলেন। নতুন নতুন চিন্তা, নতুন নতুন ভাবনা তার অন্তরকে উদ্ভাসিত করে তুলল। ছোট থেকেই মহৎ ভাবনার অধিকারী হয়ে উঠলেন তিনি। সাধারণ মানুষ থেকে হলেন স্বতন্ত্র। তাইতো লোকেরা তাঁকে ছোটবেলা থেকেই 'সত্যবাদী, 'সাধু' বলে ডাকত। সত্যিই সার্থক নাম হজরত। 'হজরত' মানে তো মহামান্য।

দিন যত যায়, হজরতের প্রতি মানুষ ততই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। লোকেরা তাঁকে বিশ্বাস ক'রে তাঁর কাছে টাকা জমা রাখে। ছোট-খাটো ঝগড়া বিবাদ হলে স্থির সিদ্ধান্তের জন্য ছুটে আসে হজরতের কাছে। তিনি যা বিচার করেন তাই যেন অভ্রান্ত।

হজরতের দিন রাত্রির চিন্তা—কি করে মানুষকে ধর্মের গ্লানি থেকে মুক্তি দেওয়া যায়! কি করে সত্যের আলোকে নতুন পথ দেখানো যায়! দারুণ একটা অস্থিরতার মধ্যে দিন যাপন করতে লাগলেন তিনি।

কিন্তু এত অস্থিরতা কেন? সংসারের অভাব অনটন অনেকটা লাঘব হয়েছে তখন। খাদিজা নামে এক ধনী ব্যবসায়ী মহিলা দিয়েছে তাঁকে চাকরী। তাঁর সততা ও জ্ঞানে গুণে মুগ্ধ খাদিজা পরে বিয়ে করলেন হজরতকে। অভাব বলতে আর রইল না কিছুই। সুবিধা হল তাঁর ধর্মমতকে প্রচার করতে। অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ধর্মে মন দিলেন তিনি। লাভ করতে লাগলেন নতুন সব অলৌকিক অনুভূতি।

ঘর যেন আর পারছিল না তাঁকে টেনে রাখতে। দেখা দেয় মানসিক অস্থিরতা। সত্যের আলো তাঁকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকল।

তাই তিনি সরে এলেন নির্জনে। এলেন মক্কা নগরী থেকে তিন মাইল দূরে এক পাহাড়ের গুহায়। এই তাঁর নিশ্চিত শান্তির আবাস। আপন মনে সাধনজীবনে মগ্ন হলেন। অতিক্রান্ত হয়ে গেল দীর্ঘ পনেরটা বছর। সিদ্ধিলাভ করলেন সাধনায়। চোখ মেলে দেখলেন অনেকগুলো দিন চলে গেছে। এসে দাঁড়িয়েছেন একচল্লিশের কোঠায়। পরমসত্য লাভের পর তাঁর কণ্ঠ থেকে প্রথম ধ্বনিত হ'ল —ঈশ্বর এক। জগতে দ্বিতীয় ঈশ্বর বা আল্লাহ্ নেই। আল্লাহ্ই সমগ্র বিশ্বের সকল ঘটনার পরিচালক। তিনি নিরাকার। তার কোনো আকার নেই।

এর পরেই শুরু হল তাঁর ধর্মপ্রচার। নাম দেওয়া হল তার ইসলাম ধর্ম। যারা এ ধর্ম গ্রহণ করত, তাদের বলা হত মুসলমান। অবশ্য প্রথমে তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করেছিলেন খাদিজা, তাঁর স্ত্রী, তাঁর কাকার ছেলে আলী এবং আবুবকর। ইসলাম ধর্মে এঁদের নাম উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু সাধারণ মানুষ তখনো আত্মদম্ভে অস্থির। কুসংস্কারে মগ্ন। অনাচার, অত্যাচার এবং ব্যভিচারে ভাসিয়ে দিয়েছে তাদের জীবন। পুতুল পূজার মধ্যেই মত্ততা। ওতেই তাদের আনন্দ। অনেক চেষ্টা, অনেক শ্রম করেও তিন বছরে মক্কায় চল্লিশ জনের বেশী শিষ্য সংগ্রহ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। তিন বছর পরে আবুবকরের অনুরোধে নতুন করে অভিযান শুরু করলেন হজরত। ব্যাপক ভাবে চলল ধর্মপ্রচার। কিন্তু আরবের কোরেশ বংশ করতে

লাগল তাঁর বিরোধিতা। নানাভাবে অত্যাচার করতে লাগল হজরতের শিষ্যদের উপর। এমন কি তাঁদের প্রাণনাশের অপচেষ্টা থেকেও বিরত হল না তাঁরা।

ভয় পেলেন না হজরত। সত্যের ধ্বজা উঁচুতে তুলে তিনি চলেছেন সত্যের আলো জ্বেলে দিতে। কেন ভয় পাবেন? সত্যের আঘাতে মিথ্যা একদিন মুখ লুকাতে বাধ্য। অত্যাচার যত কঠোরতর হয়, সত্যের ঔজ্জ্বল্য তত দিগন্ত উদ্ভাসিত করে তোলে। তাছাড়া ঈশ্বর যাঁর সহায়, দুষ্টলোক তাঁর কি করতে পারে? তাই নানা অত্যাচার সহ্য করেও হজরত তাঁর ধর্ম প্রচার করে চললেন।

কিন্তু তাঁর সঙ্গীদের দুঃখের অন্ত রইল না। সাধু বেলাল নামে ছিল এক ক্রীতদাস। তিনি গ্রহণ করেছিলেন ইসলাম ধর্ম। ফলে তাঁকে তাঁর প্রভুর কাছে অশেষ নির্যাতন সইতে হল। নানা ধরণের দৈহিক অত্যাচার সহ্য করেও তিনি তাঁর আজানের ধ্বনিতে মানুষকে কাঁদিয়ে ফেলতেন। কিন্তু হজরত এত অত্যাচার প্রত্যক্ষ করতে আর পারলেন না। তিনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে মক্কা থেকে চলে এলেন মদিনায়। মদিনাবাসী পূর্বেই শুনেছেন তাঁর নাম। এবার তাঁকে দর্শনের জন্য সব পাগল হয়ে গেল। পরম ভক্তিভরে তাঁকে গ্রহণ করল তারা। চলতে লাগল এখানে তাঁর ধর্মপ্রচার। মক্কা থেকে যেদিন মদিনায় এসেছিলেন হজরত ধর্মপ্রচার করতে সে দিনটিকে পরম পবিত্র দিন বলে মুসলমানরা মনে করেন। ঐ দিনটি থেকেই গণনা করা হয় হিজরী সাল।

মদিনা থেকেই ইসলামধর্ম তাড়াতাড়ি প্রচারিত হয়ে পড়ে।

পাঁচবছর ওখানে অতিবাহিত হল। তারপরে আবার চলে আসেন তিনি মক্কায়। এবারে কোরেশরা তার সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হলেন এবং ইসলাম ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল। কোরেশদের সঙ্গে মহম্মদকে তেত্রিশবার যুদ্ধ করতে হয়েছিল। অবশ্য তা আত্মরক্ষার জন্য। শেষ যুদ্ধে হেরে গেল কোরেশরা। ধরে নিয়ে আসা হল তাদের দল-পতিকে। সবাই ভাবল সর্বনাশ। এবারে বুঝি তাকে মেরেই ফেলবে। কিন্তু না, হজরত তাদের ছেড়ে দিলেন বিনা শর্তে। কোরেশরা গেলো বিস্ময়ে হতবাক হয়ে। হজরতের প্রেম, মমতা ও ভালবাসার কাছে করল তারা আত্মসমর্পণ। করুণাময় তাঁর করুণা দিয়ে শুচি শুদ্ধ করে নিলেন পাপীজনকে। দিলেন তাদের অমৃতের বাণী। বিরোধী কোরেশরা সবাই গ্রহণ করল হজরতের ধর্ম। তিনি তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বললেন—চিরকাল থাকবে একতাবদ্ধ হয়ে। কোনো মানুষকে ঘৃণা করবে না। প্রত্যেক মানুষই শ্রদ্ধার পাত্র। বিপদে এসে অন্যের পাশে দাঁড়াবে। পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। এক ঈশ্বর। তাঁর উপাসনার প্রথম কাজটি হল সৎকর্ম।

৬৩২ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন হজরত মোহম্মদ তাঁর অগণিত ভক্তদের ছেড়ে ইহলোক ত্যাগ করেন। কিন্তু রেখে গেলেন তাঁর অমূল্য উপদেশ, যাকে বলা হয় কোরাণ। এই পুস্তক মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। হজরত মোহম্মদ ধর্মের ইতিহাসে চিরবরেণ্য হয়ে আছেন। আজও তিনি ঈশ্বরের প্রেরিত দূত বা পয়গম্বর আল্লাহ্‌র রসুল।

অনুশীলনী

১। আরব দেশের সবচেয়ে বড় শহরের নাম কি? সেখানে কি ছিল? সেটার সম্বন্ধে দু' চার কথা লিখ?

২। হজরত মহম্মদ কোথায় জন্মেছিলেন? তিনি কোন বংশে জন্মেছিলেন? তার বাবা মার নাম কি?

৩। বাল্যকালে হজরত কেমন ছিলেন? কারা তাকে লালন পালন করেছিলেন?

৪। তিনি কি বিদ্যা লাভ করেন নি এবং কেন? লোকে তাঁকে কি বলে ডাকত? সে নামের মানে কি?

৫। খাদিজা কে? তিনি পরে কাকে বিয়ে করলেন? যাকে বিয়ে করল তার ধর্মমত প্রচারে সুবিধা হোলো কেন?

৬। সিদ্ধি লাভের পর হজরতের কণ্ঠ থেকে প্রথমে কি ধ্বনিত হোলো? তার প্রচারিত ধর্মের নাম কি? প্রথমে কারা তার ধর্মমত গ্রহণ করেছিলেন?

৭। হজরত মক্কা থেকে মদিনায় এলেন কেন? যেদিন এসেছিলেন সে দিনটিকে কারা কি বলে মনে করে? হিজরী সাল কি?

৮। কোরেশদের সঙ্গে কয়বার মহম্মদের যুদ্ধ হয়? শেষ যুদ্ধে কারা হেরেছিল? মহম্মদ কোরেশদের ও তাদের দলপতির সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করলেন?

রামমোহন

কালীমন্দিরে পূজার উপচার সাজান। ফুল, ফল, বিল্বপত্র, মিষ্টি। আর কিছু সময় পরেই পূজা আরম্ভ হবে।

ছোট্ট একটি শিশু মন্দিরের মধ্যে ঢুকল। বসল গিয়ে পূজার আসনে। একবার তাকাল কালী-মায়ের মুখের পানে। নীরবে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপরেই ফুল বিল্বপত্র দু'হাতে তুলে ছড়াতে লাগল চারিদিকে। একটি বিল্ব-পত্র তুলে নিয়ে চিবোতে লাগল নির্বিকারে।

শিশুর মা শিশুকে খুঁজে খুঁজে হয়রান। কোথায়ও পাচ্ছেন না। শেষে এলেন কালীমন্দিরে। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন শিশুর কাণ্ড দেখে। কিছু বলতে পারলেন না মুখে। রাগে, দুঃখে, ভয়ে মায়ের মন কাঁপতে লাগল থরথর করে।

এমনি সময়ে এলেন পুরোহিত। ছেলেটির মাতামহ তিনি। দৌহিত্রের কাণ্ড দেখে রাগে ক্ষোভে বললেন—তোর এ ছেলে বিধর্মী হবে।

পরম সাধক ছিলেন পূজারী। কাজেই তাঁর অভিশাপ ব্যর্থ

হবার নয়। কথাটি বলেই পূজারী চমকে উঠলেন এবং বললেন—মা, অকস্মাৎ যা বললাম তা ফলবেই, তবে তোর সন্তান জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত হবে।

মাতামহের এই অভিশাপ ও আশীর্বাদ শিশুর জীবনে উভয়ই ফলেছিল।

এই ছেলেটিই আমাদের দেশবরেণ্য নেতা রাজা রামমোহন রায় নামে খ্যাত হয়েছিলেন। বাবার নাম ছিল রামকান্ত রায়। মা তারিণী দেবী। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল থানার অধীন কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী রাধানগরে জন্মগ্রহণ করেন রামমোহন রায়।

বাল্যকাল থেকেই রামমোহনের মেধা ও প্রতিভা ছিল অসীম। গ্রামের পাঠশালায় গুরুমশাইয়ের কাছে রামমোহন অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাঙলা শেখেন। মাত্র আট বছর বয়সেই বাঙলা ও ফারসী ভাষায় তাঁর বেশ জ্ঞান হল। পাটনায় গিয়ে শিখলেন আরবী। মুসলমানদের সমস্ত ধর্মগ্রন্থগুলো বেশ ভাল করে পাঠ করে ফেললেন। পিতা এবারে তাঁকে পাঠালেন কাশীতে। কাশীতে গিয়ে সংস্কৃত ভাষায় প্রচুর জ্ঞান লাভ করলেন এবং সুপণ্ডিত বলে খ্যাত হলেন। কাশী থেকে ফিরে এলেন রাধানগরে। কোরাণ, বেদান্ত পড়ে রামমোহন পুতুল পূজার বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করলেন। হিন্দুর জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কারকে ভেঙ্গে দেবার জন্য বুক বেঁধে নামলেন। ফলে মাতাপিতা ও হিন্দু সমাজের বিরাগ-ভাজন হলেন। কিন্তু রামমোহন একটুও দমে গেলেন না। মাতা-পিতাকে বাধ্য হয়েই

ত্যাগ করলেন। রামমোহন মাত্র ষোল বছর বয়সে গৃহ ত্যাগ করে চলে এলেন। পায়ে হেঁটে তিনি ভারতের প্রসিদ্ধ ধর্ম-ক্ষেত্রগুলো ঘুরতে লাগলেন। সত্য ও জ্ঞান-পিপাসু রামমোহন বৌদ্ধ-শাস্ত্র পড়বার জন্য তিব্বতে যেতে মনস্থ করলেন। দূর-দুর্গম পথ অতিক্রম করে তিনি তিব্বতে এলেন এবং লামাদের কাছে বৌদ্ধ শাস্ত্র পাঠ করলেন। বৌদ্ধ-শাস্ত্রে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করে বৌদ্ধ ধর্মের ক্রটী বিচ্যুতির কথা বলতে লাগলেন। ফল হল বিপরীত। সংস্কারাচ্ছন্ন লামারা রামমোহনকে হত্যা করবার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। রামমোহন শেষে কয়েকজন তিব্বতী রমণীর সাহায্যে পলায়ন করে প্রাণ রক্ষা করলেন।

দেশে এলেন কুড়ি বছরের রামমোহন। পিতা পুত্রের মিলন হ'ল দীর্ঘদিন পরে। আবার ঘরে ঠাঁই দিলেন তাঁকে। রামমোহন এবারে খ্রীষ্টধর্ম জানবার জন্য বাইবেল পড়তে শুরু করলেন। সমস্ত ধর্ম-শাস্ত্র ও গ্রন্থ পাঠ করে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করলেন রামমোহন। আবার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগলেন। সমাজ তাঁকে প্রতিরোধ করল। মাতা-পিতা আত্মীয় পরিজন সকলে তাঁর ওপর বিরূপ হয়ে গেল। এই সময় তাঁর পিতার মৃত্যু হল। বিষয় সম্পত্তি নিয়ে রামমোহনের সঙ্গে সবাই দুর্ব্যবহার করল। কিন্তু তিনি সেখানে মনের উদারতার পরিচয় দিয়ে সবাইকে স্তব্ধ করে দিলেন। চাকরী নিলেন এসে ইংরেজ সরকারের অধীনে।

কর্ম থেকে অবসর নিয়ে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলকাতার নিজবাড়ীতে 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করলেন। এই সভার কাজ

হ'ল—ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ বোঝান এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন। বেদান্ত, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে মূল মর্ম সংগ্রহ করে প্রকাশ করলেন বাংলা বই। এর পূর্ব্বে তিনি ফারসী ভাষায় একেশ্বরবাদ সমর্থন করে একটি পুস্তক রচনা করে-ছিলেন। তার নাম—"তুহফাত-উল-মুয়াহদিন"।

খ্রীষ্টান পাদরিগণ বাংলাদেশে তখন খ্রীষ্ট-ধর্ম প্রচারে ব্যস্ত। রাম-মোহন তাদের সামনে প্রবল প্রতিরোধের মত দাঁড়ালেন। দেখালেন খ্রীষ্টান ধর্মের ক্রটী বিচ্যুতি। খ্রীষ্ট-ধর্ম গ্রহণকারী হিন্দুসমাজ ধীরে ধীরে রামমোহনের পানে ফিরে তাকাল। রামমোহন হিন্দুধর্মকে নতুন সাজে ঢেলে খ্রীষ্টধর্মের কবল থেকে হিন্দুসমাজকে রক্ষা করলেন। এই সময় রামমোহনের আবির্ভাব না ঘটলে হয়ত হিন্দুধর্ম ধ্বংস হয়ে যেত।

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন ব্রাহ্ম-সভা গঠন করলেন। ১৮৩০ সালে চিৎপুরে নির্মিত হল একেশ্বরবাদীদের উপাসনা মন্দির। ১৮১১ সালে রামমোহনের চেষ্টায় প্রকাশিত হল বাঙলা সংবাদপত্র 'সংবাদ কৌমুদী'। পরের বছর তিনি প্রকাশ করেন একখানি ফারসী সংবাদ-পত্র। তার নাম "সিরাৎউল আকবর।" স্বদেশের উন্নতি সাধনের জন্য তিনি ডেভিড হেয়ারের সাহায্যে ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপন করেন। নারী জাতিকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত করেন এবং নিজেও একটি ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেন। ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনে তাঁর উৎসাহ ও চেষ্টা উল্লেখযোগ্য।

সকল দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও সহানু-ভূতি ছিল অকৃত্রিম ও গভীর। কোন দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জন করার সংবাদে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেতেন। মানুষ ভগবানের

অংশ, কাজেই মানুষ স্বীয় চেষ্টায় অসাধ্য সাধন করতে পারে বলে তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল। অদৃষ্ট নয়, স্বীয় চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রমই মানুষকে বড় করে—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস।

এবারে তিনি হিন্দুর হৃদয়হীন কুসংস্কারকে ভেঙ্গে দেবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। সতীদাহ প্রথা এবং গঙ্গাবক্ষে সন্তান নিক্ষেপের পুণ্য অর্জন থেকে দেশের অবুঝ অবলা রমণীদের বিরত করেন। ১৮১৭ সালে এই বাংলার ঘর থেকেই সাত শত হিন্দুনারীকে তাদের স্বামীর চিতায় জীবন্ত দগ্ধ করা হয়েছিল। লর্ড বেন্টিঙ্ক-এর সাহায্যে ১৮২৯ সালে সতীদাহ নিবারণ আইন পাশ করান। বাঙলা গদ্যভাষার জনক, নবভারতের স্রষ্টা, দেশপ্রেমিক রাজা রামমোহন ১৮৩৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল শহরে প্রাণত্যাগ করেন।

অনুশীলনী

১। রামমোহন কবে কোথায় জন্মেছিলেন? বাল্যকালে তিনি কালীমন্দিরে ঢুকে কি করেছিলেন? সেটা দেখে কে তাকে কি বলেছিলেন?

২। রামমোহন কি কি ভাষা শিখেছিলেন? তিনি গৃহ ত্যাগ করেছিলেন কেন? তিনি তিব্বতে কেন গেলেন এবং সেখানে কি শিক্ষালাভ করলেন?

৩। ১৮.৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কোথায় কি স্থাপন করলেন? ওটার কাজ ছিল কি? তিনি ফারসীভাষায় কি কোন পুস্তক রচনা করেছিলেন?

৪। :৮২৮ এবং ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কি কি গঠন করেছিলেন? তিনি কি কি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন?

৫। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি কেমন ছিল? তিনি হিন্দুদের কি কি কুসংস্কার ভেঙ্গে দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন এবং কার সাহায্যে কোন খ্রীষ্টাব্দে কি আইন পাশ করালেন।

বিদ্যাসাগর

বীরসিংহ থেকে কলকাতার পথে চলেছে পায়ে হেঁটে একটি ছেলে। সঙ্গে রয়েছেন পিতা। তখন এ দেশে রেলগাড়ী হয় নি। কাজেই পায়ে হেঁটেই যেতে হবে কলকাতায়। যেতে যেতে হঠাৎ ছেলেটি পিতার কাছে প্রশ্ন করল —বাবা, ওটা কি?

পিতা বললেন—মাইল স্টোন। মাইল স্টোনে অঙ্কের দ্বারা চিহ্নিত রয়েছে পথের দূরত্ব। পিতার কাছ থেকে সব বুঝে নিল ছেলেটি। পথে যেতে যেতে মাইল স্টোনের ইংরেজি সংখ্যা দেখে তার শেখা হয়ে গেল ওয়ান, টু ইত্যাদি। পুঁথি পত্তর নয় শুধু মাইল স্টোনে দৃষ্টি রেখেই ছেলেটি ইংরেজি এক, দুই শিখে ফেলল।

পিতা ছেলের মেধা দেখে বিস্মিত হলেন এবং বুঝতে পারলেন এ ছেলে ভবিষ্যতে বিরাট কেউ হবে। তা হয়েও ছিল।

১২২৭ সালের আশ্বিন মাসে ছেলেটির জন্ম হয় বীরসিংহ গ্রামে। পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতার নাম ভগবতী দেবী। ছেলেটির নাম ঈশ্বরচন্দ্র। কালো, বেঁটে, মাথা বড় একটি ছেলে।

দরিদ্র ঠাকুরদাস মাত্র পাঁচ টাকা বেতনে কলকাতায় সামান্য

একটি চাকরী করতেন। কিন্তু তাঁর মনটি ছিল বড়। পাঠশালার পড়া শেষ হলে উচ্চ শিক্ষার জন্য ছেলেকে নিয়ে এলেন কলকাতায়। ভর্তি করে দিলেন সংস্কৃত কলেজে। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি পণ্ডিত হয়ে ওঠেন। অশেষ জ্ঞান জন্মে তার ব্যাকরণ সাহিত্যে এবং অলংকার শাস্ত্রে। আরাম বিলাসে নয়—দুঃখ ও কষ্টের মধ্য দিয়ে তাঁকে পড়শুনা করতে হয়েছিল।

ঘরে তেল নেই। টীম্ টীম্ করে জ্বলছে একটি মাটির প্রদীপ। ঈশ্বরচন্দ্র বই নিয়ে পথে নেমে এল। দাঁড়াল একটি গ্যাস পোস্টের নীচে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হয়ে গেল। ঈশ্বর বইতে ডুবে রইল।

খাওয়া দাওয়ার বড় অভাব। পয়সা নেই। মাছ তরকারী কি দিয়ে কিনবে? শুধু দুটি গরম ভাত দু' ফোঁটা তেল দিয়ে মেখে নিত। তাই খেয়েই স্কুলে চলে যেত।

কিছুদিন পরে ছোট দুই ভাইও কলকাতায় এল পড়াশুনা করতে। ঈশ্বরচন্দ্রের 'পর সকলের ভার। নিজের হাতে তাদের পাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করত ঈশ্বর। রাত থাকতে উঠে এঁটো বাসন পত্তর ধুয়ে আনত সে নিজে। পিতা একদিন ঈশ্বরকে এত সব কাজ করতে দেখে বললেন—ঈশ্বর, ছোট ভাইদেরও তো একবার ডাকতে পার।

ঈশ্বর বলতো—না বাবা, ওরা কাজ না করে যদি পড়াশুনা করে তবেই আমি বেশী আনন্দ পাব।

এত দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে মানুষ হয়েছিলেন বলেই পরে তিনি দুঃখীর বন্ধু হতে পেরেছিলেন।

শিক্ষকরা তাঁকে খুব ভালবাসতেন। প্রতি বছরই বৃত্তি পেত ঈশ্বর। কিন্তু ঈশ্বরের সহপাঠীরা তাঁকে ঈর্ষা করত। এজন্য ঈশ্বর মনে মনে খুবই দুঃখ পেত।

কিন্তু যার ভিতরে আগুন, তাকে কে চেপে রাখতে পারে? মাত্র কুড়ি বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করলেন। তখনকার যুগে এর চেয়ে আর বড় উপাধি ছিল না। সংসারের অভাব কিছুটা দূর হতে লাগল। বিদ্যাসাগর পঞ্চাশ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পণ্ডিত হলেন। ইংরেজ কর্মচারী ও উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদের দেশীয় ভাষা শিক্ষা দেবার জন্য এই কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগর সাহেবদের এ দেশের ভাষা শিক্ষা দিতেন।

এরপর বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের আসনটি পেলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁর সাথে সম্পাদকের মতের অমিল হওয়াতে বিদ্যাসাগর এ পদ থেকে নিজেকে সরিয়ে আনলেন। চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে তিনি চলে এলেন ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজে। এ কলেজে তিনি অধ্যক্ষের পদ পেয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর ছোটদের জন্য যে কাজ করে গেছেন তার তুলনা হয় না। বাংলাদেশের স্কুলগুলো পরিদর্শন করে তিনি দেখলেন শিশুদের উপযোগী কোন বই নেই। তখন থেকে শুরু করেন শিশুদের উপযোগী পুস্তক রচনা করতে। বহু কষ্টে তিনি লিখলেন বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, সীতার বনবাস, শকুন্তলা প্রভৃতি গ্রন্থ। তাঁর রচিত ব্যাকরণ কৌমুদী বাংলার ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহায্য করছে। তিনি মোট বাহান্নখানি বই লিখেছিলেন। এর মধ্যে সতেরখানি সংস্কৃত, ত্রিশখানি বাংলা এবং বাকী পাঁচখানি ইংরেজী।

বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের জনক। যতি, ছেদ তিনিই প্রথম প্রবর্তন করেন।

বাংলা মায়ের কৃতী সন্তান, নারী শিক্ষার জন্য বেথুন নামে একজন ব্যক্তির সাহায্যে 'বেথুন বিদ্যালয়' স্থাপন করেন।

বিদ্যাসাগরের পণ্ডিত মন কেবলমাত্র স্কুল এবং পুস্তক রচনায় দিকেই ছিল না। দেশের কুসংস্কারগুলোর প্রতি তিনি প্রকাশ করেছেন তীব্র ঘৃণা। যা অন্যায়, অসত্য তাকে তিনি বর্জন করেছেন এবং পরকে বর্জন করতে শিখিয়েছেন।

এই দেশে স্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রীকে স্বামীর চিতায় প্রাণ দিতে হত। এ নিয়ম বহুদিন ধরে চলে আসছিল। এতে নাকি পুণ্য ছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগরের বিপ্লবী মন একদিন বিদ্রোহ জানালো। এ কেমন ধারা নিয়ম! এ কদাচার বন্ধ করবার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।

বিধবা-বিবাহ প্রচলন তাঁর জীবনের একটি পুণ্য কাজ।

বিদ্যাসাগর মা বাবাকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করতেন।

ছোট ভাইয়ের বিয়ে। মা চিঠিতে জানালেন বিদ্যাসাগরকে বাড়ি যাবার জন্য। কিন্তু অধ্যক্ষ ছুটি মঞ্জুর করলেন না। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দরখাস্ত করলেন। বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি দেখে অধ্যক্ষ সন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁর ছুটি মঞ্জুর করলেন।

বর্ষাকাল।

দামোদর নদ তখন ভয়াল। আকাশে কালো মেঘ। স্রোতের টান প্রবল। খেয়া পার হবার কোনও উপায় নেই। কিন্তু মায়ের ডাক তিনি উপেক্ষা করতে পারলেন না। ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে মায়ের নাম স্মরণ করে ঝাঁপ দিলেন দামোদরের বুকে।

তিনি যেমন বিদ্যাসাগর নামে খ্যাতি পেয়েছিলেন ঠিক তেমনি 'দয়ার সাগর' নামে তাঁর পরিচয় কিছু সামান্য নয়।

একদিন তিনি ধুতি ও গামছা নিয়ে গঙ্গায় স্নান করতে যাচ্ছিলেন।

পথে এক ভিখারী এসে চাইল বস্ত্র। বিন্দুমাত্র সংকোচ প্রকাশ না করে বিদ্যাসাগর ধুতিখানা ভিখারীর হাতে তুলে দিলেন।

তাঁর দয়া সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। সব তো আর বলা সম্ভব নয়। বড় হয়ে তোমরা এঁর সম্বন্ধে আরও অনেক কাহিনী পড়বে। পড়ে বিস্মিত হবে। দেখবে কত বিরাট মানুষ ছিলেন তিনি।

অনুশীলনী

১। বিদ্যাসাগরের মা বাবার নাম কি? তিনি কোথায় জন্মেছিলেন?

২। তিনি বাবার সঙ্গে কোথায় আসছিলেন এবং কি দেখে বাবাকে কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন? তিনি দেখে দেখে কি শিখেছিলেন?

৩। বিদ্যাসাগর মোট কতগুলো বই লিখেছিলেন? তিনি কোন কদাচার বন্ধ করতে চেষ্টা করেছিলেন? তাঁর একটি পুণ্য কাজের নাম কর।

৪। বিদ্যাসাগরের 'মাতৃভক্তি সম্বন্ধে দু'চার লাইন লেখ। বিদ্যাসাগরের অপর নামটি কি? তাঁর একটা দয়ার কাহিনী বল।

রামকৃষ্ণ

পলাশীর আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হল। দেখা দিল খৃষ্টান পাদ্রীদের ধর্ম প্রচারের ঘনঘটা। তাঁরা দলে দলে আসতে লাগলেন এদেশে। হিন্দুধর্ম তখন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত নবীনের দল আকৃষ্ট হয়ে পড়তে লাগল খৃষ্টান ধর্মের দিকে। হিন্দুধর্ম প্রায় অবলুপ্তির পথে। তাই রামমোহন নিয়ে এলেন নতুন বাণী। প্রবর্তন করলেন ব্রাহ্মধর্মের। জাতটা একটু থমকে দাঁড়াল। অনিবার্য পতন থেকে কিছুটা উন্মুক্তির পথে এল।

কিন্তু হিন্দুধর্ম ? হিন্দুধর্মকে উজ্জীবিত করলেন এক পাগল ব্রাহ্মণ। তিনি কে ? তাঁর কথাই বলছি শোন।

কামারপুকুরের দুর্গাদাস জারী করলেন একটি সমন।

কি সমন ?

গদাধর আমার অন্দর মহলে আর প্রবেশ করতে পারবে না।

অপরাধ ?

ছেলেটা বকাটে। লেখা-পড়ার নাম গন্ধ নেই। সব সময়ই হরি কথা, হরি গান নিয়ে মেতে থাকে। তাছাড়া মেয়েলী কাজ, মেয়েলী কথা, আর মেয়েদের সঙ্গে দিন রাত আড্ডায় মেতে থাকাই যার জীবনের আদর্শ—তেমন ছেলেকে আমি আমার অন্দরে প্রবেশ করতে

দেব না। বলি, আমার বাড়ীর মেয়েদের কি কোন মান সম্মান নেই? ঐ সীতানাথ পাইন গদাধরের নামে পাগল। ওখানে গিয়েই যেন গান বাজনার জলসা মেলায়। আমার এখানে কোন হরি ভক্তের ঠাঁই হবে না।

দুর্গাদাস কঠোর হলেন। কঠিন হলেন। সদা জাগ্রত রাখলেন তাঁর দৃষ্টি। গদাধর এলেই হয় একবার। ঠ্যাং পিটিয়ে ভেঙ্গে দেবেন তিনি।

কিন্তু দুর্গাদাস কঠোর হলে কি হবে? তাঁর বাড়ির মেয়েরা যে গদাধরকে না দেখে থাকতে পারে না। তারা গদাধরকে বলে—তুমি আমাদের রাধারাণী গো! রাধারাণী! রোজ আসবে। এসে আমাদের গান শুনিয়ে যাবে।

দুর্গাদাসের অন্দরের মানুষেরা গদাধরকে অন্তর দিয়ে ডাকে। এই অন্তরের ডাক শোনবার জন্যই গদাধর থাকে কান পেতে। ডাক শুনলে আর থাকতে পারে না।

কিন্তু কি করে যাবে সে দুর্গাদাসের অন্দর মহলে? বাইরে যে কড়া প্রহরা। দুয়ার আগলে বসে আছেন দুর্গাদাস নিজেই। রেখেছেন সতর্ক দৃষ্টি। গদাধরকে কিছুতেই তিনি প্রবেশ করতে দেবেন না তাঁর বাড়ীতে। কিন্তু গদাধরকেও সেই নিষেধের প্রাচীরটা ভেঙ্গে যেতে হবে অন্দরে।

তা কেমন করে সম্ভব হবে? যে মনের মানুষ, তাকে কি বাইরের বাঁধা বন্ধন আটকে রাখতে পারে?

শোন তবে তোমাদের মত ছোট্ট গদাধরের কীর্তি।

সেদিন ছিল হাটবার। সবে গঞ্জের হাট ভেঙ্গেছে। লোকেরা যে যার ঘর পানে ফিরে চলেছে। অনেকক্ষণ হল সূর্য গিয়েছে অস্ত পাটে।

সন্ধ্যাও নামে নামে। দিনের আলোটুকু আকাশ থেকে মুছে গিয়েছে। ঘনিয়ে এসেছে অন্ধকার। গাঁয়ের বধূরা এসেছে তুলসী মঞ্চে প্রদীপ জ্বালাতে। চাষীরা লাঙ্গল কাঁধে নিয়ে খামারে ফিরে যাচ্ছে।

গদাধরও গঞ্জ থেকে ফিরছে। নেমেছে রাত। পথ প্রান্তর দেখতে দেখতে জনশূন্য হয়ে গেল। গদাধর ধারণ করল একটি মেয়ের বেশ। এসে দাঁড়াল দুর্গাদাসের সামনে। বেশবাসে এতটুকু বাহার নেই। সাদাসিধে সরল সুন্দর একটি মেয়ে।

দুর্গাদাস একটু ঝুঁকে পড়ে দেখে নিলেন। শুধালেন স্নেহ-শান্ত কণ্ঠে—একি, এত রাত্রে? তুমি তাঁতী পাড়ার মেয়ে নও?

গদাধর বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

বললেন দুর্গাদাস—তা এত রাত্রে! কোত্থেকে এলে?

মধুর কণ্ঠে গদাধর বলল—হাট থেকে।

দুর্গাদাস আবার জিজ্ঞেস করলেন—কি চাও তুমি?

বলল মেয়েটি—সঙ্গীরা আমাকে একা ফেলে রেখে চলে গেছে। এত রাত্রে আমি কেমন করে যাই এখন বাড়িতে?

একটু থেমে আবার বিনীত ভাবে বলতে লাগলো গদাধর—যদি রাত্রিটা থাকবার মত একটু ঠাঁই দেন তো বড্ড উপকার হয়।

দুর্গাদাস বলেন—তা বেশ তো। ভেতর গিয়ে মেয়েদের বল। থেকে যাবেখন রাতটা।

মেয়েটি অন্দরে ঢুকে পড়ল। জমিয়ে দিল মেয়ে-বৌদের সঙ্গে আলাপ। কত কথা। ওদের সবাইকেই যেন মুহূর্তে জয় করে নিল মেয়েটি।

ওদিকে চন্দ্রমণি তো কেঁদে কেঁদে চোখদুটো ফেলেছেন ফুলিয়ে।

কেন?

তাঁর গদাধর যে এখনো বাড়ী ফিরছে না। এত রাত তো করে না কখনো! তবে কি কোন অমঙ্গল হ'ল?

রাত্রির নির্জনতা ঠেলে ভেসে আসছে শিয়ালের কণ্ঠ। আর শোনা যাচ্ছে ঝিঁঝিদের ডাক। বড়দা রামেশ্বরও যেন আর ঠিক থাকতে পারছেন না। ঘর থেকে তিনি বেরিয়ে পড়েছেন। গ্রামের পথে হাঁটছেন আর যাকে দেখছেন তাকেই জিজ্ঞেস করছেন—তোমরা আমাদের গদাধরকে দেখেছ?

কেউ কোন হদিস দিতে পারছে না। শেষে রামেশ্বর আর কোন উপায় না পেয়ে উচ্চ কণ্ঠে ডাকতে লাগলেন—গদাধর! গদা-ধর!

দীর্ঘ সে কণ্ঠস্বর রাত্রির অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু গদাধরের সাড়াই মিলছে না।

রামেশ্বরের চোখেও জল এল। দাঁড়ালেন এসে পথের বাঁকে। উচ্চ স্বরে ডাকতে লাগলেন তাঁর প্রাণের গদাধরকে—গদাধর! গদা-ধর!

হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়ালেন পাইনদের সদরে। দেখা হয়ে গেল দুর্গাদাসের সঙ্গে। জিজ্ঞেস করলেন দুর্গাদাস—এত রাত্রে কোথায় চললে হে ঠাকুর?

রামেশ্বর চিন্তিত হয়ে বললেন—আর কেন বলছেন, গদাধর এখনো ফেরেনি বাড়িতে। যাই দেখি সীতানাথ পাইনদের বাড়িতে একবার খোঁজ করি। দুর্গদাস বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ ওখানে থাকতে পারে।

সেখানেও নেই গদাধর। রামেশ্বর এখন কি করবেন? কোন উপায়ই আর পাচ্ছেন না খুঁজে। রাত্রির অন্ধকারের মত তাঁর মনটাও অন্ধকারে ঢেকে যেতে লাগল।

আবার ডাকতে লাগলেন রামেশ্বর—গ-দা-ধ-র! ও গদাধর

সহসা দুর্গাদাসের অন্দর মুখর করে সাড়া দিল তাঁতী মেয়েটি —যাই গো দাদা, এই যে এখানে আমি।

আর কোন কথা নয়। দুর্গাদাসের বাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়েই দে ছুট।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল বাড়ির লোকেরা। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন দুর্গাদাস। ছুটে এল বাড়ির মেয়েরা দুর্গাদাসের কাছে। বলল সব কথা খুলে। তাঁতী মেয়েই যে গদাধর তা কেউই বুঝতে পারেনি।

দুর্গাদাসের দু' চোখে জল এল। বুকফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন দুর্গাদাস—প্রভু আমার অহঙ্কার চূর্ণ করেছেন। ওরে আজ থেকে আমার সমস্ত দুয়ার চিরকাল গদাধরের জন্য খোলা থাকবে।

১২৪২ সালের ৫ই ফাল্গুন বুধবার ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের ঘরে গদাধরের জন্ম হয়েছিল। তোমরা বড় হয়ে আরও কত জানবে এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে। নরবেশে স্বয়ং নারায়ণ এসেছিলেন মানুষের দুঃখ হাহাকার দূর করতে। ভারতবর্ষের সে দুর্দিনের অন্ধকারে গদাধর ঠাকুর মানুষের হৃদয়ে জ্বেলে দিয়েছিলেন আলো। এবং সে আলোর দ্যুতি শুধু ভারতবর্ষেই নয়—ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল সারাটা বিশ্বে। মানুষের মনোলোকে।

এই গদাধর ঠাকুর কে জান তো?

ইনি আমাদের দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির পূজারী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। বেদান্ত সাধক তোতাপুরী শ্রীরামকৃষ্ণ নাম রেখেছিলেন গদাধরের। কত বড় বড় লোক সেখানে এসেছিলেন। তোমরা বড় হয়ে আরও কত কাহিনী তাঁর সম্বন্ধে জানবে।

অনুশীলনী

১। রামকৃষ্ণদেবের বাল্যকালে কি নাম ছিল? তাঁর মা বাবার নাম কি? দুর্গাদাস তার বাড়ীতে কাকে যেতে বারণ করেছিল এবং কেন?

২। গদাধর দুর্গাদাসের বাড়ীতে কি ভাবে ঢুকল? কার ডাকে সে বেড়িয়ে এল? দুর্গাদাসের তখন অনুশোচনা হল কেন এবং পরে তিনি কি করলেন?

৩। ভারতের দুর্দিনে কে আলো জ্বালিয়েছিলেন? তোতাপুরী তাঁর কি নাম দিয়েছিলেন?

———

বিবেকানন্দ

বিশ্বনাথ দত্তের বৈঠকখানা। রাত পোহালে মক্কেলদের ভিড় ভেঙ্গে পড়ে। নামজাদা এটর্নী বিশ্বনাথ। লোক তো আসবেই। আসে নানান জাতের লোক।

বৈঠকখানা ঘরে তাদের জন্য সার বাঁধা রয়েছে কতকগুলো হুঁকো। একটা আর দুটো নয়—অনেকগুলো।

কেন ?

এক হুঁকোতে সব জাতের লোক তামাক খেলে যে তাঁদের জাত যাবে। তাই সার বাঁধা রয়েছে আলাদা আলাদা হুঁকো।

বিশ্বনাথ দত্তের ছোট্ট ছেলে বিলে ঢুকল বৈঠকখানা ঘরে।

ছেলেটি তাকায় চারিদিকে। না কেউ নেই। এগিয়ে যায় সেই সার বাঁধা হুঁকোগুলোর কাছে। মুসলমানদের হুঁকোটা হাতে নিয়ে শুরু করে দিল টানতে।

কোত্থেকে যেন এসে পড়লেন বিশ্বনাথ দত্ত। মাথায় যেন তাঁর বজ্র ভেঙ্গে পড়ল। কতক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে রইলেন। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন এক সময়—ওকি হচ্ছে রে বিলে ?

বুক ফুলিয়ে বলল বিলে– দেখছি জাত যায় কি! যাকে রেখেছি ছোট করে, তাকে ছুঁলে কি হয়?

নির্বাক্ বিশ্বনাথ দত্ত। কোন জবাব দিতে পারলেন না। নীরবে সেখান থেকে চলে এলেন।

সাথী সঙ্গীদের ডেকে জড়ো করেছে বিলে। সবাই এসে হাজির। বলল বিলে—চল আমরা ধ্যান ধ্যান খেলি। ধ্যান ধ্যান খেলা আবার কি?

কেন জোড় আসনে বসব। থাকবো চোখ বুজে টান হয়ে বসে। মনে মনে ডাকবো ভগবানকে।

বেশ খেলা তো! সবাই রাজী।

সকলে গায়ে ছাই মেখেছে। বসেছে ধ্যান ধ্যান খেলতে।

চোখ বুজে পদ্মাসনে সে কি ধ্যান। একেবারে জ্ঞানহারা হয়ে গেল বিলে।

কিন্তু আর সকলে?

তারা কেউ মিটি মিটি চাইছে। কারো কোমর টন্ টন্ করছে। কেউ ভাবছে এখন উঠে যাই। কিন্তু বিলে একদম ধ্যানের মধ্যে ডুবে গিয়েছে।

হঠাৎ একটি ছেলে চোখ মেলে তাকিয়েই চীৎকার দিয়ে উঠে পড়ল —'সাপ', 'সাপ'।

বিরাট এক বিষধর সাপ ওদের সামনে। সবাই গেল পালিয়ে। কিন্তু বিলে?

তার কথা কেউ ভাবলও না। তাকে একা ফেলে রেখেই যে যার প্রাণের ভয়ে পালিয়ে বাঁচল।

বিলের ধ্যান তখনো ভাঙ্গেনি। এত সব কাণ্ড ঘটে গেল বটে, বিলে তার কিছুই জানল না। কিছুই গেল না তার কানে।

সাপটি বিলের কাছে এল এগিয়ে। বিরাট সাপ। বিলে তারই কাছে চোখ বোজা অবস্থায় ঠায় বসে।

ছেলেরা সবাই ছুটে এল বিলের বাবা মার কাছে। বলল সব কথা। তাঁরা তো শুনেই ছুটতে লাগলেন। এসে কি দেখলেন ?

দেখলেন বিলে তখনো ঠিক অটল হয়ে বসে আছে চোখবুজেই।

হৈ চৈ হট্টগোল।

সাপ গেল পালিয়ে। কিন্তু বিলের ধ্যান তো ভাঙ্গে না। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন জননী ভুবনেশ্বরী, আর বিশ্বনাথ দত্ত। তাকিয়ে আছেন তাঁদের প্রাণপ্রিয় পুত্র বিলের পানে। আহা কি সুন্দর মুখ। মুদিত নয়নে অঝোর বারিধারা।

বাবা-মার মন বেদনায় টনটন করে উঠলো—বুঝি ছেলে আমাদের থাকবে না ঘরে। এখনি যার ধ্যানে এত মন, না জানি বড় হলে কি হয় ?

ধীরে ধীরে বিলে ধ্যানের জগৎ থেকে ফিরে এল। তাকাল চোখ মেলে।

কি হয়েছে ? এত লোক কেন ?

মা বললেন—তুই কি আর বাঁচতিস। কত বড় সাপ এসেছিল তোর সামনে। আমরা না এসে পড়লে সর্বনাশ হয়ে যেত।

বিলে বলল—কই আমি তো সাপের কথা কিছুই জানি না।

সবাই বলে সর্বনাশ হত। কিন্তু বিলে বলে—আমি এক অপূর্ব আনন্দ উপভোগ করছিলাম।

বাড়ির সামনে এসেছে এক বাউল। বিলের মন গলে গেল।

ঘর থেকে কাপড় জামা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল নীচে।

মা তো রেগে আগুন। এমন দুষ্টু ছেলে নিয়ে ভুবনেশ্বরীর হয়েছে মরণ।

চাঁপাফুল বিলে বড় ভালবাসে। সঙ্গীদের নিয়ে একদিন এক বন্ধুর বাড়িতে এসে হাজির হল। ছিল সেখানে একটি চাঁপা ফুলের গাছ। বিলে এক লাফে গিয়ে উঠে বসল সেই গাছের ডালে। শুধু উঠেই কি ক্ষান্ত? চাঁপার ডালে শুয়ে বসে সে কত না খেলা।

বাড়ির কর্তা দেখে তো রেগে আগুন। বলা নেই, কওয়া নেই, গিয়ে গাছে চেপে বসেছে। কিন্তু এমন দুষ্ট ছেলেকে তো ধমকে নামান যাবেনা। দেখাতে হবে ভয়। তাই করলেন বাড়ির কর্তা। ডাকলেন বিলেকে। বললেন—ও গাছটায় উঠো না।

বিলে বললে—কি হয় উঠলে?

কর্তা বললেন—ও গাছে ব্রহ্মদত্যি থাকে। বিলে বললে—সেটা দেখতে কি রকম?

কর্তা বললেন—ওরে বাবা সে বড় ভয়ঙ্কর! ঘুরে বেড়ায় সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে রাতের অন্ধকারে। বিলে বললে—তা বেড়াক না। তাতে আমার কি?

বাড়ির কর্তা হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন।

কিন্তু বিলে দেখবে একবার ব্রহ্মদৈত্যটাকে। শুনেছে রাতের অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায় ব্রহ্মদৈত্য। তাই একদিন সঙ্গীদের নিয়ে সন্ধ্যার পরে এলো সে চাঁপাগাছের কাছে। সঙ্গীরা বলল—না যাসনে। সত্যি তোর ঘাড় মটকে দেবে কিন্তু।

বিলে একগাল হেসে বলল—তুই একটা আস্ত বোকা? তোর

ঠাকুরদা ভয় দেখাবার জন্য এতসব কথা বলে গেলেন। সত্যি যদি ব্রহ্মদৈত্য থাকত, তবে এতক্ষণে নিশ্চয়ই দিত আমার ঘাড় মটকে।

লোকে একটা কিছু কথা বললেই বিলে বিশ্বাস করত না। চাইত ট্রুথ এবং প্রুফ। সত্য আর প্রমাণ।

লোকে বলে ঈশ্বর আছেন। কিন্তু কোথায়? বিলে প্রথমে গেল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে। জিজ্ঞাসা করল—আপনি ঈশ্বর দেখেছেন।

দেবেন্দ্রনাথ বললেন—তোমার চোখে যোগীর দৃষ্টি। বিলে পেল না তার জবাব।

কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের কালীর পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন বিলেকে—যেমন তোকে দেখছি ঠিক তেমনি দেখেছি ঈশ্বরকে। তুই ডাক, তুইও তার দেখা পাবি।

বিলে এবারে ঈশ্বর দর্শনের জন্য মত্ত হয়ে উঠল।

দীক্ষা গ্রহণ করল শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। ঠাকুর তাকে জগতের কাজে নামিয়ে দিলেন। জীবের সেবা করাই হল তার জীবনের ব্রত।

বিলে কেমন করে নরেন হ'ল, কেমন করে হ'ল বিবেকানন্দ, তা তোমরা বড় হয়ে পড়বে।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই জানুয়ারী ভোর ৬টায় সিমলার দত্ত-বংশে বিলের জন্ম হয়।

অনুশীলনী

১। বিবেকানন্দের ছোটকালে কি নাম ছিল? তাঁর মা বাবার নাম কি? তিনি কাদের হুঁকোতে তামাক খেয়েছিলেন? তিনি কবে জন্মেছিলেন?

২। সঙ্গীদের সঙ্গে বিবেকানন্দ কি খেলা করেছিলেন এবং সে দিন কি ঘটনা ঘটেছিল?

৩। বিবেকানন্দ কোন ফুল ভালবাসত? বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে কি করেছিল? বাড়ীর কর্ত্তা তাঁকে কি বলেছিল?

৪। বিবেকানন্দ ঈশ্বর আছে কিনা জানার জন্য কার কার কাছে গেল? তাঁরা তাঁকে কি বলেছিলেন? তিনি কার কাছে দীক্ষা নিলেন।

———

রবীন্দ্রনাথ

ছোট একটি ছেলে।

দেখতে সুন্দর। রং ফরসা। টানা টানা নাক চোখ। চোখের কোণে বাইরের জগৎকে দেখবার স্বপ্ন। কিন্তু বাড়ির চাকর রেখেছে চোখে চোখে। তার শাসন কড়া। শ্যামা দিয়েছে খড়ি দিয়ে গণ্ডী এঁকে। বাইরে যাওয়া চলবে না। গণ্ডীর মধ্যেই বসে থাকতে হবে। গণ্ডীর মধ্যে বসিয়ে দিয়ে চাকর শ্যামা চোখ বড় বড় করে বলত, "যদি এই লাইনের বাইরে আসবে, তবে বিপদ হবে।" চুপটি করে বসে থাকত ছেলেটি গণ্ডীর মধ্যে। মন ছুটে যেত বাইরের দিকে। বাইরের আলো, বাতাস, গাছ তাকে আহ্বান জানাতো। কিন্তু উপায় নেই। ছেলেটি ওখানে বসেই দেখতো সান বাঁধানো পুকুর ঘাট, পুরানো বট গাছ, পাখীদের চঞ্চলতা।

সন্ধ্যার সময় মিলত একটু ছুটি। কিন্তু তা আর কতক্ষণ? শ্যামার হাত থেকে ছুটি পেয়ে ঈশ্বরের হাতে পড়ত সে। ঈশ্বর ছিল আফিংখোর। খাওয়ার জন্য কান্নাকাটি করলে ভয় দেখাতো ঈশ্বর। ভয়ে কান্না।

একদিন এই ছেলেটি কান্না সুরু করলো স্কুলের জন্য। সে স্কুলে

যাবে। বাধ্য হয়ে বাড়ির লোক তাকে স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। কিন্তু স্কুলে এসেও সেই শাসনের সম্মুখে পড়ল সে। ভয় পেল। পড়া না পারলে পেতে হতো কঠিন শাস্তি। ভাল লাগল না এত নিয়ম কানুনের কঠোরতা। পালিয়ে এলো। কিন্তু তাই বলে পড়াশোনা করত না—এমন নয়। বাড়িতে বসে রীতিমত পড়াশোনা করত সে। কাব্য, জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস—সব বিষয়ই তাঁকে পড়তে হতো।

কেবল লেখাপড়া নিয়েই ছেলেটি থাকতো না। প্রতিদিন ভোরে উঠে এক পালোয়ানের সাথে তাঁকে কুস্তি লড়তে হতো। রবিবার সকাল বেলা গান শিখতে হতো তাকে।

বল তো ছেলেটি কে?

জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র রবীন্দ্রনাথ। মায়ের নাম ছিল সারদা দেবী।

খুব ছোট বেলা থেকে রবীন্দ্রনাথের ঝোঁক ছিল কবিতা রচনার দিকে। কবিতা লিখতেন। পড়ে শোনাতেন অন্য পাঁচজনকে। শ্রীকণ্ঠবাবু নামে তিনি একজন ভালো শ্রোতা পেয়েছিলেন। শ্রীকণ্ঠ বাবুর মাথা ভর্তি ছিল বিরাট টাক। দাঁতহীন মুখে সকল সময় লেগে থাকতো হাসি। তাঁর একটি প্রিয় গান ছিল। সেই গানটি রবীন্দ্রনাথের মুখে সবাইকে শুনিয়ে বেড়াতে তিনি ভালবাসতেন। রবীন্দ্রনাথ খুব সুন্দর গান গাইতে পারতেন। একবার তিনি তাঁর পিতার কাছে গান গেয়ে পাঁচ-শ' টাকার চেক উপহার পেয়েছিলেন।

সবে মাত্র পৈতা হয়েছে তাঁর। মাথা নেড়া। নেড়া মাথায় স্কুলে যাবার অসুবিধা। ভাবনায় পড়লেন রবীন্দ্রনাথ। এই ভাবনা থেকে পিতা দেবেন্দ্রনাথ তাকে উদ্ধার করলেন। নিজের সঙ্গে তিনি নিয়ে যেতে চাইলেন ছেলেকে হিমালয়ে। আনন্দে নেচে উঠল রবীন্দ্রনাথের

মন। তিনি যেন এই চাইছিলেন। চাইছিলেন মুক্তমনের অবাধ আনন্দ।

রেলগাড়ীতে চড়ে চললেন বাবার সাথে। এই তাঁর প্রথম রেল যাত্রা। রেলগাড়ীর জানালা দিয়ে তিনি দেখলেন কৃষকের সরল হাসি, সবুজ অরণ্য। এসে পেঁছিলেন বোলপুর। ওখান থেকে গেলেন আরও অনেক জায়গায়। ঘুরে বেড়ালেন পাহাড়ে পাহাড়ে।

পিতা দেবেন্দ্রনাথ বীরভূম জেলার বোলপুরে 'শান্তিনিকেতন' নাম দিয়ে একখানা বাড়ি তৈরী করলেন। পিতার সঙ্গে এখানে এসে রবীন্দ্রনাথ বাস করতেন। প্রভাতের আনন্দ উজ্জ্বল মুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করে পিতার সাথে উপাসনা করতেন।

ছেলেকে সুশিক্ষিত করার জন্য দেবেন্দ্রনাথ নিজের হাতে তাঁর কর্ম্ম-তালিকা ঠিক করে দিয়েছিলেন। গৃহশিক্ষক এবং পিতার কাছে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ, জ্যোতিষ গ্রন্থ অধ্যয়ন করতেন।

সতের বছর বয়সে তিনি পেলেন বিলেত যাবার সুযোগ। কিন্তু দূর থেকে যা ভেবেছিলেন ওখানকার মাটি স্পর্শ করে তিনি দেখলেন তাঁর কল্পনার সাথে মিলছে না। ওখানকার সমাজজীবন, মানুষের আচার ব্যবহার প্রথম প্রথম তাঁর মোটেই ভালো লাগে নি। কিন্তু কিছু দিন পর তিনি নিরপেক্ষ বিচারকের দৃষ্টি দিয়ে বিচার করে দেখলেন যে, ওদের মধ্যে ভালো জিনিষও আছে। ভারতবর্ষের মত ওরা নির্জীব নয়। ওদের মধ্যে আছে কর্মচাঞ্চল্য। ওরা বসে নেই। কাজের মধ্যে ওদের যথেষ্ট আনন্দ। রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে আসার কিছু দিন আগে ডাঃ স্কট নামে এক ভদ্রলোকের বাড়ি উঠেছিলেন। মিসেস

স্কট তাঁকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছিলেন। তাই দেশে ফিরে আসার সময় তিনি কেঁদে বলেছিলেন, "এমনি করে চলেই যদি যাবে, তবে কেন এসেছিলে ?

দেশে ফিরে রবীন্দ্রনাথ ডুবে গেলেন সাহিত্যের মধ্যে। লিখলেন অনেক কবিতা, অনেক গান। পড়ে শোনালেন অন্য পাঁচজনকে। প্রশংসা পেলেন।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ। রবীন্দ্রনাথের বয়স পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হ'ল। দেশ-বাসী ও সাহিত্য অনুরাগীরা তাঁর প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেন।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের ও ভারতের জীবনে এল এক পরম লগ্ন। রবীন্দ্রনাথের অসামান্য কাব্যগ্রন্থ "গীতাঞ্জলি" দেশ বিদেশের বহু গুণীজনের মনকে জয় করে নিতে সক্ষম হ'ল। সাহিত্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার স্বরূপ রবীন্দ্রনাথকে দেওয়া হ'ল "নোবেল প্রাইজ।"

কেবল সাহিত্যে নয়। প্রত্যেকটি ভাল কাজের মধ্যে নিজেকে সঁপে দিতে এতটুকু দ্বিধা করেননি তিনি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা। মানুষের মনে ভয়। জীবনের প্রতি প্রচণ্ড মায়া। বাঁচতে হবে। বাঁচবার জন্য মানুষ দিনের পর দিন সংগ্রাম করে চলেছে। এ সময় কবির লেখনী হাতিয়ারের কাজ করলো। অন্যায় ও অসত্যের প্রতি তিনি জানালেন তীব্র ধিক্কার।

১৯১৫ সাল। বিশ্ববন্দিত কবিকে ইংরেজরা 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করলো। এ সম্মান রাজকীয় সম্মান।

যুদ্ধ শেষ হ'ল। মানুষ তখন ক্লান্ত। বাঁচবার পথ নেই। চারিদিকে হাহাকার। ১৯১৯ সালে জালিওয়ানাবাগে নিরস্ত্র ভারতবাসীর ওপর নির্মমভাবে গুলি চালিয়ে বহু ভারতবাসীকে হত্যা করলো ইংরেজরা। রবীন্দ্রনাথ চুপ ক'রে রইলেন না। সিংহবিক্রমে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন। চরম ঘৃণায় তিনি ত্যাগ করলেন 'নাইট' উপাধি। বড়লাটের কাছে অগ্নিক্ষরা ভাষায় এই অত্যাচারের প্রতিবাদ জানালেন। তিনি যে পত্র-খানি লিখেছিলেন বড়লাটের কাছে, তা কখনো ভুলবার নয়।

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অজস্র দান। ষাট বছরেরও বেশী সময় তাঁর লেখনী সৃষ্টি করেছে কত কাব্য, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, সাহিত্য, সমালোচনা ও নাটক। ভগ্নহৃদয়, সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাত-সঙ্গীত, বলাকা, পুনশ্চ, জন্মদিনে, চিত্রা, কথা, নৈবেদ্য, শিশু, খেয়া, গীতাঞ্জলি, মানসী, সোনার তরী, গোরা, মুক্তধারা, রাজারাণী, গল্পগুচ্ছ প্রভৃতি তাঁর লেখা কয়েকখানি গ্রন্থ।

গঙ্গা, যমুনার স্নেহধন্য মাটিতে যে প্রতিভা একদিন প্রভাস্বর হয়ে উঠেছিল, সে প্রতিভার জ্যোতি কাল বিজয়ী।

অনুশীলনী

১। ছোটকালে রবীন্দ্রনাথ কার শাসনে ছিলেন? সে তাঁকে কি রকমে রাখত? সন্ধ্যার পরে কার শাসনে থাকতেন?

২। রবীন্দ্রনাথ স্কুলে যাবার বায়না করা সত্বেও স্কুল থেকে পালিয়ে এলেন কেন?

৩। ছেলেবেলা থেকে রবীন্দ্রনাথের কিসের ঝোঁক ছিল ? কে তাঁর ভাল শ্রোতা ছিল ? তিনি কি করতেন ?

৪। পিতা রবীন্দ্রনাথকে কত টাকার চেক কেন উপহার দিয়েছিলেন ? পৈতার পরে রবীন্দ্রনাথ কি অসুবিধায় পড়েছিলেন ? কে তাঁকে কিভাবে উদ্ধার করেছিলেন ?

৫। তিনি রেলগাড়ীতে চড়ে কোথায় গিয়েছিলেন ? সেখানে তিনি কার সঙ্গে বাস করতেন ও তার দৈনন্দিন কর্মতালিকা কি ছিল ?

৬। সতের বছর বয়সে তিনি কোথায় গেলেন এবং সেখানে গিয়ে তিনি কি দেখলেন ? মিসেস স্কট তাঁকে কি বললেন ?

৭। রবীন্দ্রনাথ কোন সালে কিসের জন্য কি পুরস্কার পেয়েছিলেন এবং তাঁর কয়েকটি রচনার নাম কর।

———

জগদীশচন্দ্র

১৯০০ সাল।

ফরাসীর প্যারী নগরী। বৈজ্ঞানিকদের একটি সভা বসেছে। বিশ্বের খ্যাতনামা বিজ্ঞানীরা এসে মিলিত হয়েছেন। যে যাঁর প্রতিভার কথা বলবেন। তুলে ধরবেন আপন দেশকে গৌরবের উচ্চ শিখরে।

বহু গুণী ব্যক্তি সভায় উপস্থিত। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দও। কিন্তু তিনি ঠিক স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছেন না। বারে বারেই একটা প্রশ্ন তাঁকে চঞ্চল করে তুলছে—এ সভায় এমন কেউ কি নেই, যিনি ভারতবর্ষকে গৌরবের মুকুট পরাতে পারেন।

এমন সময়ে একটি যুবা উঠে দাঁড়াল। বলিষ্ঠ দেহ। উজ্জ্বল চোখ। দৃঢ় বিশ্বাসে দীপ্ত মুখ।

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল। দাঁড়াল এসে মঞ্চের সামনে। দাঁড়াল মাথা উঁচু করে। সুরু হল বক্তৃতা। স্তব্ধ হয়ে গেল বিশ্ববাসী। ভারতের প্রতি জন্মাল তাদের সম্মান ও শ্রদ্ধা। যুবক প্রমাণ করল, গাছেরও প্রাণ আছে। তারাও কথা বলে। শুধু কি তাই? আজ যে ঘরে ঘরে রেডিওর মারফৎ আমরা বিশ্বের সংবাদ, গান, বাজনা, খেলা-ধুলার খবর পাচ্ছি, এ আবিষ্কারটির সূত্রও এই প্রতিভাবান ভারতীয় যুবা কর্তৃকই প্রথমে আবিষ্কৃত হয়েছিল।

এখানে তোমরা বুঝতে পারছ না ছেলেটি কে ?

ইনিই আমাদের প্রণম্য বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু।

১৮৫৮ সালের ৩০শে নভেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন বিক্রমপুরের রাড়িখাল গ্রামে। পিতার নাম ছিল ভগবানচন্দ্র। মাতার নাম বামাসুন্দরী দেবী। ভগবানচন্দ্র ছিলেন বিরাট প্রতাপশালী হাকিম। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল অপরিসীম। জগদীশচন্দ্র বসু তখন ছোট। তাঁর বাবা জেল ফেরৎ এক দুর্দান্ত ডাকাতকে ধরে এনেছিলেন তাঁর বাড়িতে। ডাকাতের মুখোমুখি ভগবানচন্দ্র দাঁড়িয়ে বললেন—বল্, এই হীন কাজ জীবনে আর করবি না।

ডাকাত ভগবানচন্দ্রের কাছে প্রতিজ্ঞা করল—না হুজুর। আর কোনদিন আমি ডাকাতি করব না।

ভগবানচন্দ্র ডাকাতের কথা শুনে খুশী হয়ে তাকে নিজের ঘরে পরিচারকরূপে রেখে দিলেন। জগদীশচন্দ্র যেন পরম সঙ্গী পেয়ে গেলেন। ছোট বেলায় নিভৃতে বসে ডাকাতের কথায় মজে যেতেন। শুনতেন সব ডাকাতদের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী। যাত্রা, গান, কথকতা এবং কবিতা শুনতেও তিনি খুব ভালবাসতেন। প্রকৃতির সঙ্গে ছিল তার মনের নিবিড় যোগাযোগ। ছায়াশান্ত গাছের নীচে, জলভরা পুকুর পারে মুক্ত আকাশের তলে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি অতিবাহিত করে দিতেন। অত্যন্ত কল্পনা প্রবণ ছিল তাঁর মনটি। গাছ, ফুল, জল আকাশ বড় প্রিয় ছিল তাঁর। মাঝে মাঝেই পিতাকে নানা ধরণের প্রশ্ন করতেন জগদীশচন্দ্র। পিতা ছেলের পানে তাকিয়ে বলতেন—আমি কি সব জানিরে ? বড় হয়ে তুই সব জানতে পারবি।

গ্রামের শিক্ষা শেষ করে জগদীশচন্দ্র চলে এলেন কলকাতায়। ভর্তি হলেন হেয়ার স্কুলে। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলেন। এফ, এ ও

বি, এ পরীক্ষায় পাশ করে গেলেন। এবারে দূর দেশে যাত্রা করলেন জগদীশচন্দ্র। এলেন ইংলণ্ডে। ১৮৮৪ খৃঃ কেম্ব্রিজে ট্রাইপস্ পরীক্ষায় পাশ করে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি, এস্, সি উপাধি লাভ করলেন। ফিরে এলেন স্বদেশে। পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে।

জগদীশচন্দ্রের খ্যাতি ও সুনাম শুধু ভারতবর্ষেই নয়—বিদেশেও ছড়িয়ে পড়ল। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি, এস, সি উপাধি দানে সম্মানিত করল। ইউরোপের নানা দেশে ঘুরতে লাগলেন তিনি। লিভারপুলের ব্রিটিশ এ্যাসোসিয়েশন, লণ্ডনের রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউশন, জার্মানীর কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্যারির ফিজিক্যাল সোসাইটি তাঁকে জানাল বিপুল অভ্যর্থনা।

তিনি ১৯১২ সালে সি, আই এবং ১৯১৭ সালে 'নাইট' উপাধি লাভ করলেন। ১৯২৭ সালে ভারতবর্ষে বিজ্ঞান মহাসভার মূল সভা-পতি নির্বাচিত হলেন।

বাংলা সাহিত্যেও ছিল তাঁর অসীম অনুরাগ ও পাণ্ডিত্য। কবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জগদীশচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু।

জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি স্বরূপ আজও কলকাতায় 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' বর্তমান। এটি একটি বিরাট বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র। ১৯১৭ সালে এই মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

দেশকে তিনি প্রাণ ও মন দিয়ে ভালবাসতেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধা হিসাবে সিষ্টার নিবেদিতার সহকর্মী] ছিলেন তিনি। দেশবাসী তাঁর ঋণ চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। লেডী অবলা বসু ছিলেন জগদীশচন্দ্রের সহধর্মিণী। ১৯৩৭ সালের ২৩শে নভেম্বর গিরিডিতে জগদীশচন্দ্র শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

অনুশীলনী

১। কোন্ সালে কোন্ নগরীতে বৈজ্ঞানিকদের সভা বসেছিল? সে সময় স্বামীজী কি ভাবছিলেন? এমন সময় কে কি করলেন?

২। জগদীশচন্দ্রের মা বাবার নাম কি? তিনি কোন্ সালে কোথায় জন্মেছিলেন? কে কার কাছে ডাকাতি করব না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোলো?

৩। তিনি কোন কলেজে অধ্যাপনা করতেন এবং কি আবিষ্কার করেছিলেন? ১৯১২, ১৯১৭ এবং ১৯২৭ সাল তাঁহার জীবনে উল্লেখযোগ্য কেন?

৪। তিনি কোন্ বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধুর নাম কি? স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি কার সহকর্মী ছিলেন?

———

লেনিন

১৮৭০ সাল।

১০ই এপ্রিল।

পৃথিবীর ইতিহাসে আজও এ দিনটি স্মরণীয়।

কিন্তু কেন?

এই তারিখেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন মহান নেতা লেনিন। জন্মগ্রহণ করেছিলেন রাশিয়ার খরস্রোতা মহানদী ভল্‌গার তীরবর্তী সিমবিস্ক শহরে। বর্তমানে শহরটির, নাম হল লেনিনোগ্রাম।

লেনিনের পিতার নাম ছিল ইলিয়া নিকোলায়েভিচ উলিয়ানভ। মাতার নাম মারিয়া আলেক্সান্দ্র-ভনা। আর লেনিনের পুরো নামটি ছিল ভ্‌লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ।

পাঁচ বছর বয়স থেকে শুরু হয় লেনিনের লেখাপড়া। ন' বছর বয়সে ভর্তি হন সিমবিস্ক জিমনাসিয়মের প্রথম শ্রেণীতে। ক্লাসের পর ক্লাস পাশ করে এলেন প্রথম পুরস্কার পেয়ে।

রুশ লেখকদের লেখা ছিল তার অতীব প্রিয়। একদিকে শ্চেড্রিন, তলস্তয়ের লেখা ; অন্যদিকে বিপ্লবী চের্নিশেভস্কির জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ পুস্তক—তিনি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করতেন। সেদিনকার রুশ দেশের বিপ্লবী তরুণদের কাছে এ লেখাগুলো ছিল পথের দিশারী।

কিশোর লেনিনের মেধা ও চরিত্রের দৃঢ়তা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিল। তাঁর চরিত্র গঠনে সাহায্য করেছিল তার পারিবারিক পরিবেশ ও রুশ সাহিত্য।

জার সরকারের পুঁজিবাদী শোষণ ও ভূমিদাস প্রথা ছোট্ট লেনিনকে ভাবিয়ে তুলত। সাধারণ মানুষের অভাব-অনটন, মেহনতী মানুষের দুঃখ-বেদনা তাকে বিশেষ ভাবে আঘাত করত। শাসক ও জমিদার শ্রেণীর ব্যবহারে তাঁর মন বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চায়। স্কুল জীবনেই প্রকাশ পায় সে ভাবধারাগুলো। তাইতো একদিন বিদ্যালয়ের পরিচালক তাঁর রচনা খাতা পড়ে বলেন—কি সব নিপীড়িত শ্রেণীর কথা লিখছে, ও সব এখানে কেন?

লেনিনের দাদা আলেক্সান্দার ছিলেন একজন মস্ত বিপ্লবী। দাদার কাজগুলো তাঁর খুব ভাল লাগত। তাই সবার চেয়ে দাদাকে ভালবাসতেন বেশী। দাদাই ছিল তার জীবনের আদর্শ। পড়তেন তিনি পিটার্সবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। মেধাবী ছাত্র। সকলের বিরাট আশা ছিল তাঁকে নিয়ে। নিশ্চয়ই আলেক্সান্দার হবে একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক।

কিন্তু সে পথে যাওয়া হল না। তিনি বেছে নিলেন জারের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াইয়ের পথ। লেনিনের মধ্যেও ক্রমে তা সংক্রামিত হতে লাগল। তিনি তার দাদার কাছেই শুনলেন প্রথম মার্কসবাদের কথা।

দুটি ফুলের মত ভাই। বাবা-মা আর বোন। বেশ সুন্দর একটি সংসার। শিক্ষা দীক্ষায় আদর্শ পরিবার। কিন্তু ভাঙন এল ১৮৮৬ সালে। হঠাৎ মারা গেলেন লেনিনের পিতা। দুঃখের রাত্রি নেমে এল সংসারে। এ বেদনার ক্ষত শুকোতে না শুকোতেই এল আর একটা প্রচণ্ড আঘাত।

১৮৮৭ সাল। মার্চ মাস।

পিটার্সবুর্গে গ্রেপ্তার হলেন তাঁর দাদা। কঠোর অভিযোগ আনা হল তাঁর বিরুদ্ধে।

কি অভিযোগ ?

তিনি নাকি তৃতীয় জারের হত্যার চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন।

রাজদ্রোহী আলেক্সান্দারের কি সাজা হবে ? মায়ের মন অস্থির। লেনিন দিন রাত ভাবেন শুধু দাদার কথা। অবশেষে রায় বের হল। সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করেই হলেন না ক্ষান্ত। মে মাসে শ্লিসেনবুর্গ দুর্গে দেওয়া হল তাঁকে ফাঁসি।

লেনিনের দু' চোখ বেয়ে টপ্ টপ্ করে জল গড়িয়ে পড়ল। মায়ের আর্তনাদে অস্থির লেনিন এগিয়ে এসে মুছিয়ে দিলেন তাঁর চোখ। দিলেন সান্ত্বনা। ধীরে ধীরে প্রাণের পঞ্জরে পঞ্জরে জ্বলে উঠতে লাগল বিপ্লবের আগুন। দাদার ফাঁসি তাঁর সারাটা জীবনকে আলোড়িত করে দিল। তিনি বেছে নিলেন ঐ পথ। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই লেনিন বুঝলেন ব্যক্তি হত্যা দ্বারা বিপ্লব ঘটান যায় না। ওতে সৃষ্টি হয় ভীতি ও সন্ত্রাসের। দাদা ও তার সাথীদের ত্যাগ ও পৌরুষের কাছে লেনিন মাথা নত করলেন বটে, কিন্তু বললেন, 'না আমরা ও পথে যাব না। ও পথে যাওয়া চলে না।'

মৃত্যু পরিবর্তন আনতে পারে না। সমাজের পরিবর্তন আসবে জনগণের মাধ্যমে। তাই লেনিন গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে লাগলেন সামাজিক বিজ্ঞান। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে উত্তীর্ণ হলেন লেনিন। লাভ করলেন স্বর্ণপদক।

১৮৮৭-র আগষ্টে লেনিন কার্জন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন আইনের ছাত্র হিসেবে। ডিসেম্বরে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের করে দেওয়া হল

তাঁকে। অপরাধ? তিনি প্রগতিশীল ছাত্র সংসদের একজন সহৃদয় শরিক। শুধু বহিষ্কার নয়—অবশেষে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। জেল-খানার দারোগা বললেন লেনিনকে, 'হৈ হাঙ্গামায় কি আর হবে ছোকরা। শেষটা তো এই দেয়াল।'

লেনিন তাঁর জবাবে বলেছিলেন, 'ঘূণ ধরা। ধাক্কা দিলেই ভেঙ্গে পড়বে।'

সতের বছরের লেনিন ঝাঁপিয়ে পড়লেন দেশের কাজে। শুরু হল তাঁর বিপ্লবী জীবন। বেছে নিলেন দুর্গমের পথ।

লেনিনকে অন্তরীণ করা হল গুবেনিয়ার ককুশকিনো গ্রামে। এখন সে গ্রামটির নাম লেনিনোগ্রাম। পুলিশ রাখল তাঁর উপর কড়া নজর। অজ পাড়াগাঁ। কেউ নেই পাশে। মায়ের কথা, দাদার স্মৃতি, বোনের কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে। কিন্তু সব ভাবনাকে ছাপিয়ে উঠে দেশের ঐ গরীব মানুষগুলোর করুণ মুখ। তারা যেন আকুল আহ্বান জানাচ্ছে তাঁকে। তারা চাইছে শোষণ থেকে মুক্তি, চাইছে মানুষের মত বাঁচতে।

জেলখানার কারাগারে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে তাঁর পড়াশোনা। তাছাড়া ওখানে দ্বিতীয় কাজ নেই কিছু। এক বছর পরে মুক্তি পেলেন লেনিন। চাইলেন উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিদেশ যাত্রার অনুমতি। কিন্তু জার সরকার সে আদেশ দিলেন না। কারণ লেনিনের নাম তখন অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের তালিকাভুক্ত।

তোমরা বড় হয়ে পড়বে মহান নেতা লেনিনের বিরাট জীবনী। বিশ্ব আজ এই নেতার পূজারী। আমাদের কিশোর কবি সুকান্ত লেনিনের উদ্দেশ্যে লিখে গেছে—

লেনিন ভেঙেছে বিশ্বে জনস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ
অন্যায়ের মুখোমুখি লেনিন জানায় প্রতিবাদ।
মৃত্যুর সমুদ্র শেষ, পালে লাগে উদ্দাম বাতাস।
মুক্তির শ্যামল তীর চোখে পড়ে, আন্দোলিত ঘাস।
লেনিন ভূমিষ্ঠ রক্তে, ক্লীবতার কাছে নেই ঋণ,
বিপ্লব স্পন্দিত বুকে, মনে হয় আমিই লেনিন।

রাশিয়া থেকে উচ্ছেদ করেছিলেন লেনিন জারতন্ত্র। প্রতিষ্ঠিত করেছেন সমাজতন্ত্র। বিশ্বের ইতিহাসে লেনিনের অবদান—একটি মহান পথের ইঙ্গিত দিয়েছে।

অনুশীলনী

১। লেনিনের পুরো নাম কি? তিনি কোন সালে কোথায় জন্মেছিলেন? তাঁর মা বাবার নাম কি?

২। লেনিন কোথাকার কোন ইস্কুলে পড়েছিলেন। তাঁর প্রিয় লেখকদের নাম কর।

৩। কোন সরকারের কোন নীতি লেনিনকে ভাবিয়ে তুলেছিলেন? তাঁর দাদা কি ছিলেন? সবাই তাঁর সম্বন্ধে কি ভাবত? তিনি কি হয়েছিলেন?

৪। কি কারণে লেনিনের দাদার মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল। সেটা তাঁর অন্তরে কিরূপ প্রতিক্রিয়া করেছিল?

৫। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে লেনিন কোথায় ভর্তি হয়েছিলেন? সেখানে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হোলো কেন? দারোগার কথার উত্তরে তিনি কি বলেছিলেন?

গান্ধীজী

রাজকোটের একটি স্কুলে পরিদর্শক এসেছেন স্কুল পরিদর্শন করতে। পরিদর্শক প্রতিটি ক্লাস পরিদর্শন করবেন। দেখবেন কেমন পড়াশুনা করছে ছাত্ররা। স্কুলবাড়ির কোলাহল থেমে গেছে। একটা থমথমে ভাব। প্রতিটি ছাত্র আজ ভয়ে চুপ হয়ে গিয়েছে।

পরিদর্শক মশাই ঢুকবেন একটি শ্রেণীতে। একবার তাকিয়ে দেখলেন স্কুলঘরের অবস্থা। শ্রেণী শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষক দাঁড়িয়ে আছেন এক পাশে। তাদের মনেও একটা অজানা ভয়। ছাত্ররা যদি ঠিক ঠিক জবাব দিতে না পারে তবে যে স্কুলের নাম যাবে খারাপ হয়ে। লোকেরা করবে নিন্দা।

ছাত্রদের কয়েকটি বানান লিখতে দিলেন পরিদর্শক। ছেলেরা সবাই লিখতে শুরু করলো মাথা নীচু কোরে। শ্রেণী শিক্ষকমশাই চোখ রাখছেন ছাত্রদের খাতার দিকে। যদি ভুল হয় তবে সুযোগ বুঝে ঠিক করে দিতে বলবেন।

একটি ছেলের খাতার দিকে তাকিয়ে শিক্ষকমশাই থমকে দাঁড়ালেন। ছেলেটি একটি বানান ভুল লিখেছে। ছেলেটির বিপদ বুঝে শিক্ষক ইশারা করলেন পাশের ছেলের খাতা দেখে লিখতে।

ছেলেটি নীরব হয়ে ভাবল খানিকটা সময়। কি করবে সে? একদিকে বানান ভুল হওয়ার লজ্জা, অন্য দিকে পরের খাতা দেখে লিখে পাপ করা। শিক্ষকের কথা সে শুনলো না। ভুল লেখার অপরাধে হয়ত বা শাস্তি সে পাবে কিন্তু পাপ সে করবে না।

বলতো কে এই ছেলেটি?

এঁরই নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। ভবিষ্যতে তিনি মহাত্মা গান্ধী নামে জগতের একজন বিখ্যাত লোক বলে পরিচিত হয়েছিলেন।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর গুজরাটের পোরবন্দরে মহাত্মা গান্ধীর জন্ম হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মাত্র আঠারো বছর বয়সে তিনি ব্যারিষ্টারী পড়তে বিলেত যান। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতে ফিরে আসেন। বোম্বাই হাই-কোর্টে তিনি শুরু করলেন আইন ব্যবসা। কিন্তু পারলেন না মোটেই সুবিধা করতে।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী একটি মোকদ্দমা পরিচালনা করবার জন্য গেলেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। আফ্রিকায় এসে তিনি দেখলেন এক করুণ দৃশ্য। প্রবাসী ভারতীয়রা কৃষ্ণাঙ্গ বলে তাদের উপর শ্বেতাঙ্গরা করত অসহনীয় অত্যাচার। এই অবস্থা থেকে, লাঞ্ছনা থেকে ভারতবাসীকে মুক্তি দেবার জন্য তিনি তৈরী হলেন।

এ কাজ করবার সময় তিনি অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করেছিলেন।

একদিন গান্ধীজী প্রিটোরিয়ার ফুটপাথ দিয়ে হাঁটছিলেন। হঠাৎ কোথা থেকে এক ইউরোপীয় সিপাই তাঁকে দিল এক ধাক্কা। গান্ধীজী পড়ে গেলেন রাস্তায়। সিপাই মারলো লাথি গান্ধীজীকে।

ঠিক ঐ সময় গান্ধীজীর এক ইংরেজ বন্ধু যাচ্ছিলেন রাজপথ

দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে। তিনি এ ঘটনা দেখে কষ্ট পেলেন। ছুটে এসে গান্ধীজীকে বললেন যে, গান্ধীজী নালিশ করলে তিনি সাক্ষ্য দেবেন।

গান্ধীজী জোরাল কণ্ঠে সেদিন জানিয়েছিলেন—"এ পদাঘাত তো শুধু আমার একার ওপর নয়—একটা গোটা জাতির ওপর। কাজেই আমার নালিশ শুধু আমার তরফ থেকে নয়—সমগ্র ভারতবাসীর তরফ থেকে। আর নালিশ ঐ সিপাইয়ের বিরুদ্ধে নয়—আপনাদের বর্ণ বৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে।"

অন্যায় অসত্যকে তিনি কোনদিনই প্রশ্রয় দেননি। মিথ্যাকে তিনি সকল সময় দূরে সরিয়ে রাখতেন। ভয় বলে কোন কথা তিনি জানতেন না। দরদী মানুষ ছিলেন গান্ধীজী। লোকের দুঃখ কষ্ট দেখলে তিনি অধীর হয়ে পড়তেন। নিজের ভালমন্দ না ভেবেই এগিয়ে যেতেন অপরকে সাহায্য করতে। জগতের সেবায় তিনি নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

একবার উত্তর প্রদেশের রাজপথ দিয়ে গান্ধীজী যাচ্ছিলেন। পথের ধারে একজন কুষ্ঠরোগীকে পড়ে থাকতে দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। রোগীর সারা গায়ে মল। মাছি ভন্ ভন্ করছে সারা ক্ষতে। তাড়াবার মত শক্তি তার নেই। অসহ্য বেদনায় লোকটি কষ্ট পাচ্ছে। ধীরে ধীরে গান্ধীজী এগিয়ে গেলেন লোকটির কাছে। দরদী মন দিয়ে তিনি নিজের কাপড় ছিঁড়ে ক্ষত স্থান বেঁধে দিলেন। ব্যবস্থা করলেন খাবারের।

এরপর তিনি সবরমতী আশ্রমে প্রতিষ্ঠা করলেন একটি কুষ্ঠাশ্রম। নিজের হাতে তিনি সেবা করতেন রোগীদের।

ইংরেজের শাসন পাশ থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করবার জন্য তিনি বহুবার আন্দোলন করেছিলেন। বহুবার সত্যাগ্রহ করেছিলেন।

সত্যাগ্রহ কি ?

অপরকে হিংসার দ্বারা জয় না করে নিজে দুঃখ বরণ করে বিরোধী-কে স্নেহ, ভালবাসা দিয়ে জয় করাই হ'ল সত্যাগ্রহ।

তিনি মানুষকে শেখাতে লাগলেন হিংসা দিয়ে জয় করা থেকে অহিংসার দ্বারা জয় করা অনেক সোজা।

সারা জীবন তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন এই ভারতবর্ষের জন্য। নিজের সুখ, নিজের যশের প্রতি তাঁর কোনো লোভ ছিল না। ভারতবাসী তাই তাঁকে 'মহাত্মা', 'জাতির জনক' বলে সম্বোধন করত এবং আজও করে।

দেশ স্বাধীন হ'ল। পরাধীনতার বন্ধন থেকে দেশকে মুক্ত ক'রে তিনি সমগ্র দেশবাসীর কাছ থেকে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে চির বিদায় নিলেন।

অনুশীলনী

১। গান্ধীজীর পুরো নাম কি ? তিনি কোথায় কোন সালে জন্মেছিলেন ?

২। গান্ধীজী কোন স্কুলে পড়তেন ? সেখানে স্কুল পরিদর্শক এলে কি ঘটনা ঘটেছিল ?

৩। গান্ধীজী ব্যারিষ্টারী পড়তে কোন সালে কোথায় গিয়েছিলেন ? ১৮৯৩ সালে তিনি কি জন্য কোথায় গেলেন ? সেখানে তিনি কি দেখে ব্যথিত হলেন ?

৪। গান্ধীজীকে ইংরেজ সিপাহী পদাঘাত করলে তাঁর ইংরেজ বন্ধুকে তিনি কি বলেছিলেন ? কোথাকার কোন রাজপথে তিনি কি দেখে দুঃখ পেলেন ?

৫। তিনি সবরমতী আশ্রমে কি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ? সত্যাগ্রহ কি ? দেশের লোক তাঁকে মহাত্মা বলে কেন ?

শ্রীঅরবিন্দ

আলিপুরের সেসান জজের আদালত। বিচারক বিচারে বসেছেন। সম্মুখে বিদ্রোহী বাঙালী। ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল।

শাস্তিটাও কঠিন হবে। রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। তার অপরাধ তো চরমই। দাঁড়ালেন সরকারী ব্যারিষ্টার। জোরাল যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করলেন আসামীকে অপরাধী বলে। কি শাস্তি হবে? অপ-রাধের শাস্তি ফাঁসি বৈ আর কিছু হতে পারে না। তবে তাই হবে। বিচারে আসামীর ফাঁসিই নির্ধারিত হ'ল।

বাইরে তখন জনতার কণ্ঠে কল গুঞ্জন। কারো চোখে জল। কারো বুকে জ্বলছে স্বদেশপ্রেমের আগুন। এমনি সময় উঠে দাঁড়ালেন আসামী পক্ষের ব্যারিষ্টার। কি আর তিনি বলবেন? নামহীন, গোত্র-হীন সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ব্যক্তির পক্ষে এত বড় মামলায় কি-ই বা করবার থাকতে পারে? সওয়াল শুরু হ'ল। শুরু হ'ল আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ খণ্ডনের শুভ পর্ব। একটার পর একটা করে সবই প্রায় মিথ্যা প্রমাণিত হতে লাগলো।

বিচারপতি বসলেন সোজা হয়ে। তরুণ ব্যারিষ্টার, অপরিচিত

ব্যারিষ্টার এমনি সময়ে বজ্রদৃঢ় কণ্ঠে বললেন—"আমি শুধু আজ এ কথাই আপনাদের কাছে নিবেদন করতে চাই যে, একদিন মানুষ এঁর নাম স্মরণ করবে দেশপ্রেমের চারণ কবিরূপে, সেদিন লোকে এঁর স্মৃতি-পদতলে অর্ঘ্য নিয়ে আসবে দেশাত্মবোধের ঋষি বলে, সেদিন এঁরই বাণী ভারতবর্ষের সমুদ্রতট লঙ্ঘন করে দেশ দেশান্তরে নিত্য নব নব মানবের হৃদয়ে প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুলবে।"

সত্যে পরিণত হ'ল তরুণ ব্যারিষ্টারের বাণী। ফাঁসির আসামী লড়লেন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা। জয়ী হলেন তিনি। ফিরে এলেন মরণ মঞ্চ থেকে। ভারত আত্মার সাগ্নিক সঙ্গীতে মুখর হলেন ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাস। জয়রথে আবির্ভূত হলেন দেবোপম শ্রীঅরবিন্দ।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

আকাশে বাতাসে মুক্তির অগ্নিমন্ত্র। বাংলাও পিছিয়ে নেই। এমনি দিনে আবির্ভাব ঘটল অরবিন্দের।

অতি আধুনিক একটি পরিবার। তাদের চালচলনে সাহেবী কায়দা। আচার ব্যবহারেও তাই। অরবিন্দের বাবা ছিলেন ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ। চাকুরী করতেন তিনি ইণ্ডিয়ান মেডিকেল বিভাগে। পাঁচ বছর বয়সে অরবিন্দের শিক্ষাজীবন সুরু হয়। পিতার মনে উচ্চ আশা ছিল। তিনি তাঁকে ভর্তি করলেন ইংরেজি স্কুলে—দার্জিলিং-এর কনভেণ্টে। ভাইদের মধ্যে অরবিন্দ ছিলেন সেজো। বড় বিনয় ও মনমোহন, ছোট বারীন্দ্র। বোনও ছিলেন একজন ; তাঁর নাম সরোজিনী।

কিছুদিনের মধ্যেই অরবিন্দ শিক্ষকদের প্রিয় পাত্র হলেন। পিতা চাইলেন অরবিন্দকে সাহেব করতে। তাই সাত বছরের ছেলেকে নিয়ে

কৃষ্ণধন যাত্রা করলেন বিলাতে। সাহেবের কাছে অরবিন্দ এবং অন্যান্য ভাইদের রেখে কৃষ্ণধন দেশে ফিরলেন।

এখানের পড়া শেষ করে কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংস কলেজে ভর্তি হলেন। আই, সি, এস পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরী হলেন। আঠারো বছর বয়সে আই, সি, এস পরীক্ষা দিলেন অরবিন্দ। চতুর্থ হলেন পরীক্ষায়। কিন্তু অশ্বারোহণে হলেন অকৃতকার্য। অরবিন্দ একটুও বিচলিত হলেন না। আবার গিয়ে পড়াশুনা আরম্ভ করলেন কেম্ব্রিজে। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ক্লাসিক্স ট্রাইপোজ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করলেন। দেশের কাজে নেমে পড়লেন অরবিন্দ।

তখন বাংলার ঘরে ঘরে বিদ্রোহের আগুন। "বন্দেমাতরম্" পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করলেন অরবিন্দ। শাসক দল হলো চঞ্চল। দিতে চাইল এই তরুণ বিদ্রোহীকে সাজা। রবীন্দ্রনাথ গেয়ে উঠলেন— 'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।'

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১লা মে কিংসফোর্ডের হত্যার ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত হলেন অরবিন্দ। আদালতে জবানবন্দী দিতে উঠে অরবিন্দ বললেন "স্বাধীনতার বাণী উচ্চারণ করা যদি অপরাধ হয়, তাহা হইলে আমি অপরাধী। স্বাধীনতার বাণী উচ্চারণ যদি আইন বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে আমি দোষী। স্বাধীনতা আমার জাগরণের চিন্তা— আমার নিদ্রার স্বপ্ন।"

জেল থেকে বেরিয়ে একটি বছর নীরব রইলেন। কিন্তু আবার কাজের মাঝে ডুবে গেলেন। 'কর্মযোগীন' এবং 'ধর্ম' নামে ত্ব'খানা সাপ্তাহিক কাগজ প্রকাশ করলেন। সরকারে দৃষ্টি পড়াতে পণ্ডিচেরীতে

চলে এলেন অরবিন্দ। করলেন আত্মগোপন। রাজনৈতিক জীবনের অবসান হল।

এখানে এসে ভগবানের চিন্তায় কাল কাটাতে লাগলেন। সাধন ভজন ও ঈশ্বরের আরাধনায় ডুবে গেলেন তিনি। হলেন একজন বিখ্যাত যোগী।

দেশ বিদেশ থেকে বহু গুণী ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা এসে আশ্রয় গ্রহণ করলেন ঋষির পদতলে। হলেন ধন্য। ভারতীয় যোগ ও যোগী সম্বন্ধে তাঁদের তৃষ্ণার শেষ নেই। অসীম অনন্ত এ সাধন সমুদ্রের বিন্দু কণা পেয়ে কত জীবন যে ধন্য হয়ে গেল তার হিসেব কে রাখে!

অনুশীলনী

১। অরবিন্দের বাবার নাম কি? তিনি কোন স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন? কত বছর বয়সে তিনি বিলাতে যান?

২। তিনি কোন পত্রিকার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করলেন? আদালতে তিনি কি বললেন?

৩। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি কোন কোন কাগজ বের করেছিলেন এবং সরকারের দৃষ্টি এড়াতে তিনি কোথায় চলে গেলেন? গুণীজনেরা কেন তাঁর কাছে আসতো?

———

নেতাজী

ছোট্ট একটি ছেলে।

বসেছে মায়ের কাছে। শুনছে গল্প। মা গল্প বলে চলেছেন। গল্প বলছেন ধীরে ধীরে! কি গল্প? বলছেন রামায়ণ মহাভারতের কথা। বলছেন শিবাজী আর বিবেকানন্দের কাহিনী।

ছেলেটি মাঝে মাঝেই আনমনা হয়ে যাচ্ছে। কখনো তার মনের মধ্যে শিবাজীর ছবি ভেসে উঠছে। কখনো দেখছে সে বিবেকানন্দকে। এই দুই যুগ পুরুষ তার কাছে অতি প্রিয়। অতি আপনার। মাকে কাছে পেলেই বলে—গল্প বল মাগো।

ইনি কে জান?

তোমাদের চির পরিচিত নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী তাঁর জন্ম হয় কটকে। পিতার নাম ছিল জানকী নাথ বসু। সরকারী উকিল ছিলেন তিনি। তাঁর পৈতৃক বাসস্থান ছিল চব্বিশ পরগণার কোদালিয়া গ্রামে। সুভাষচন্দ্রের মায়ের নাম ছিল প্রভাবতী দেবী। গরীব দুঃখীদের তিনি খুব ভালবাসতেন। তাদের প্রতি ছিল তাঁর অশেষ দয়া। ছয়টি পুত্রের জননী তিনি। ছেলেরা সবাই ছিলেন দেশের কৃতী সন্তান।

হাতে-খড়ির কিছুদিন পরেই ভর্তি করে দেওয়া হল সুভাষকে মিশনারী স্কুলে। সাত বছর পড়াশোনা করলেন সেখানে।

মিশনারী স্কুলের পড়া শেষ করে ভর্তি হলেন কটকের র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে। বাড়ির ছেলেরা সবাই পরে সাহেবী পোষাক। কিন্তু এই নিয়ম ভাঙ্গলেন সুভাষচন্দ্র। তিনি পরতে আরম্ভ করলেন দেশী পোষাক। বাবা জিজ্ঞেস করলেন—নূতন পোষাক ধরলে কেন?

সুভাষচন্দ্র বললেন—"এই তো আমাদের জাতীয় পোষাক। আমাদের স্কুলের সব ছেলেরাই তো এই পোষাক পরে। এমন কি শিক্ষক মশাইরাও পরেন। তবে আমি কেন পরব না?"

এ কথা শুনে পিতার মন গর্বে ও আনন্দে ভরে গেল।

অদ্ভুত সংগঠন শক্তি ছিল সুভাষচন্দ্রের। সহরে দেখা দিল বসন্তের প্রকোপ। আক্রান্ত হল সুভাষের এক সহপাঠী। এগিয়ে গেলেন তিনি, এগিয়ে গেলেন সহপাঠীর সেবা ও শুশ্রূষা করতে। দল বেঁধে পালা করে রোগীর সেবা করতে লাগলেন। শুধু সহপাঠীর সেবাই নয়, দলবল নিয়ে বস্তি ঘুরে ঘুরে সকলের সেবায় মন দিলেন।

সুভাষচন্দ্রের শিক্ষক ছিলেন বেণীমাধব দাস। ছোট থেকেই বুঝেছিলেন—এ ছেলে সত্যিকারের মানুষ হবে। দেশের প্রিয় নেতা হয়ে মানুষের সেবা করতে পারবে। তাই বেণীমাধব সুভাষচন্দ্রের সামনে তুলে ধরতেন রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের আদর্শ।

১৯১৩ সালে সুভাষচন্দ্র র‍্যাভেন্‌শ কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। লাভ করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান। আই, এ পড়বার জন্য এলেন কলকাতায়। ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে।

ছোট বেলা থেকেই সুভাষচন্দ্রের মনে ধর্মভাব প্রবল ছিল। ধারণ করলেন তরুণ সন্ন্যাসীর বেশ। আবাল্যের সাথী হেমন্ত কুমার সরকারের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন তীর্থ পর্যটনে। খুঁজতে লাগলেন সদ্‌গুরুকে। কিন্তু মনের মত গুরু না পেয়ে আবার ঘরে ফিরে এলেন। ১৯১৫ সালে আই, এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলেন। ১৯১৬ সালে বি, এ পড়তে আরম্ভ করলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। কিন্তু এখানে ঘটল এক ঘটনা। কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন একজন ইংরেজ। নাম ই, এফ, ওটেন। সাহেব ভারতীয়দের খুব ঘৃণা করতেন। ক্লাসে এক দিন ভারতীয়দের সম্বন্ধে তিনি নানা ধরনের অশোভন মন্তব্য করলেন। সুভাষচন্দ্রের দেহের রক্ত গরম হয়ে গেল। স্বদেশের নিন্দা শুনে তিনি ওটেন সাহেবের প্রতি ক্রুদ্ধ হলেন। কলেজে তৈরী করলেন একটি দল এবং সাহেবকে সমুচিত শিক্ষা দিলেন। ফলে সুভাষচন্দ্রকে কলেজ ছেড়ে দিতে হল। কিন্তু দেশপ্রেমিক স্যার আশুতোষ এই স্বদেশভক্ত ছেলে-টিকে স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হতে সাহায্য করলেন। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে সেখান থেকে বি, এ পাশ করলেন সুভাষচন্দ্র এবং আই, সি, এস পরীক্ষা দেবার জন্য ইংলণ্ডে যাত্রা করলেন। মাত্র আট মাস পড়াশোনা করে আই, সি, এস পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করলেন। পেলেন ইংরেজ সরকারের অধীনে একটি লোভনীয় চাকরী। চাকরী বেশী দিন করতে পারলেন না। দাঁড়ালেন এসে মুক্তিকামী ভারতের সামনে। আর্ত, দুঃখীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশ সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এই সময়ে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর দেখা হল। কিন্তু দুই নেতার কর্মধারার সঙ্গে ঠিক মিল হল না। সুভাষচন্দ্র এলেন দেশবন্ধুর কাছে। দু'জনার মনের দিক থেকে বেশ মিল হল।

১৯২১ সাল। ভারতবর্ষ অসহযোগ আন্দোলনের বন্যায় প্লাবিত।

ভারত পরিদর্শন করতে এলেন প্রিন্স অব ওয়েল্স্। কলকাতায় হরতাল পালিত হল। সুভাষচন্দ্র কারাবরণ করলেন।

১৯৪১ সালে সুভাষচন্দ্রকে এলগিন রোডের বাড়ীতে অন্তরীণ করা হল। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি সেখান থেকে পালিয়ে যান। পালিয়ে যান ছদ্মবেশে পেশোয়ারে। কাবুল ঘুরে মস্কো আসেন। মস্কো থেকে বার্লিন। ১৯৪৩ সালের জুলাইতে এলেন টোকিওতে। সেখানে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সঙ্গে পরামর্শ করে গঠন করেন 'ভারতীয় জাতীয় বাহিনী'। বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধ চলেছে। সুভাষচন্দ্র জাপানের সাহায্যে তৈরী করলেন 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'। এবারে ভারত অভিযান শুরু হ'ল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র তার বাহিনী নিয়ে ব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম করে এলেন আসামের মাটিতে। উড়িয়ে দিলেন কংগ্রেসের তেরঙ্গা ঝাণ্ডা। কিন্তু রসদ ও অস্ত্রের অভাবে নেতাজীর বাহিনী বেশী দিন আর সংগ্রাম করতে পারল না। ১৯৪৫ সালের ২৬শে এপ্রিল জাপানীরা রেঙ্গুন ছেড়ে গেল। সুভাষচন্দ্র রেঙ্গুনে আরও কিছুদিন রইলেন। ইম্ফলে আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে ইংরেজের প্রবল যুদ্ধ হল। ইতিহাসের পাতায় ইম্ফলের কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে থাকবে।

১৯৪৫ সালের ১৮ই আগষ্ট জাপ রেডিও সংবাদ জানাল—বিমান দুর্ঘটনায় ভারতের প্রিয় নেতা সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু ঘটেছে।

আজও ভারতবাসী নেতাজীর মৃত্যুকে মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেনি। নেতাজীর আগমন প্রতীক্ষায় এখনো ভারতবাসী অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে। তাকিয়ে আছে সেই অনাগত ভবিষ্যতের পানে।

অনুশীলনী

১। নেতাজী কার নাম? তিনি কোন সালে কোথায় জন্মেছিলেন? তাঁর বাবা মার নাম কি?

২। কত বছর বয়সে তিনি কোন স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছিলেন? তিনি কি ধরণের পোষাক পরতে আরম্ভ করলেন? বাবার জিজ্ঞাসার উত্তরে কি বলেছিলেন?

৩। বসন্তের প্রকোপে তিনি কি ভাবে শুশ্রূষা করলেন এবং বেণীমাধব দাস তাঁর সম্বন্ধে কি ভাবতেন?

৪। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে তাঁকে কেন বহিস্কার করেছিল? কে তাঁকে স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্ত্তি করেছিলেন।

৫। তাঁকে গৃহে অন্তরীণ রাখা সত্ত্বেও ছদ্মবেশে কোথায় পালিয়ে গিয়ে কি করেছিলেন?

৬। কোথায় তিনি তেরঙ্গা ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিলেন? কোথায় আজাদ হিন্দ ফোর্সের সঙ্গে কার যুদ্ধ হয়েছিল? কোন সালে কে তাঁর মৃত্যু সংবাদ দেয়।

কিশোর কবি সুকান্ত

কলকাতার কালীঘাট।

সেখানে মহিম হালদার ষ্ট্রীট নামে আছে একটি রাস্তা।

লোকে একে বলে হালদার পাড়া।

বহু খ্যাত, বহু প্রাচীন এ পাড়া।

এই মহিম হালদার স্ট্রিটের ৪২ নম্বর বাড়িতে একটি শিশু জন্মাল ১৩৩৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ।

বেশ ছেলে। সুন্দর ছেলে। নিখুঁত। নিটোল।
বাবা-মা আদর করে নাম রাখলেন সুকান্ত।

সুকান্তর বাবার নাম ছিল ৺নিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য। দেশ ছিল পূর্ববঙ্গের ফরিদপুরে। মহিম হালদার স্ট্রীটের বাড়িটি ছিল সুকান্তর মাতামহের। ওদের বাড়িতে হ'ত সংস্কৃতের চর্চা। জ্যাঠামশাই ছিলেন সংস্কৃতের পণ্ডিত। তাই বাড়ির ভাব-ভাবনা ছিল কিছুটা প্রাচীন। এই প্রাচীনতার মধ্যেই একদিন নতুন দিনের আলোক-সম্পাত ঘটল। তাই চিন্তার ক্ষেত্রে এ সংসারটি ছিল অনেকটা প্রগতিবাদী। তা হলেও সুকান্ত কিন্তু ছোটবেলায় তার মায়ের বুকের মধ্যে শুয়ে শুয়ে শুনত কাশীদাসের মহাভারত। আর শুনত কৃত্তিবাসের রামায়ণ। সে সব গল্প শুনতে সুকান্তর খুব ভাল লাগত।

জ্যাঠামশাই আর বাবা ছিলেন দরিদ্র ঘরের মানুষ। অভাব আর অনটন ছিল তাঁদের নিত্য সঙ্গী। কষ্টে-ক্লিষ্টে চালাতে হত সংসার। সামান্য একটি পুস্তক ব্যবসা ও যজমানি ছিল তাঁদের। আয় হত সামান্য।

তাই ছোটবেলা থেকেই সুকান্ত ছিল দারিদ্র্যের সঙ্গে সুপরিচিত। ওদের বাসা ছিল বেলেঘাটায়। সংসারে দুঃখ আছে। অভাব আছে। তা বলে কোনদিনই সুকান্ত তাই নিয়ে দিন যাপন করতে ভালবাসত না। জঠরের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করেই সে তার প্রিয়জনদের সঙ্গে হাসি গল্পে মেতে থাকত। তাছাড়া বেলেঘাটার যৌথ পরিবারে দিনগুলো ভালই কাটছিল। কিন্তু সেও আর কদিন। পরে পৃথক হয়ে যেতে হ'ল। প্রকৃত অভাবটা যে কি, ক্ষুধা যে কত দুঃসহ, তা নির্মম ভাবে উপলব্ধি করতে হয়েছে সুকান্তকে এইসব দিনগুলোতে।

দুঃখের জঠরেই জন্ম নেয় আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। সুকান্তর বেলায় তার কিছু ব্যতিক্রম হয়নি। ন-দশ বছর যখন বয়স, তখন থেকেই সে ছড়া লিখে কবিখ্যাতি অর্জন করে। অবশ্য তখনো গণ্ডিটা ছিল ছোট—বাড়ির মধ্যেই শুধু। অদ্ভুত ছিল তার লেখার ভঙ্গি। 'অতিকিশোরের ছড়া' নাম দিয়ে সুকান্ত লিখল—

তোমরা আমায় নিন্দে করে দাওনা যতই গালি,
আমি কিন্তু মাখছি আমার গালেতে চুন কালি,
কোন কাজটাই পরিনাকো বলতে পারি ছড়া,
পাশের পড়া পড়িনা ছাই পড়ি ফেলের পড়া।
... ...
বাবা-দাদা সবার কাছেই গোঁয়ার এবং মন্দ,
ভালো হয়ে থাকার সঙ্গে লেগেই আছে দ্বন্দ্ব।
পড়তে বসে থাকে আমার পথের দিকে চোখ,
পথের চেয়ে পথের লোকের দিকেই বেশী ঝোঁক।
... ...
ভুল করি ভাই যখন তখন, শোধরাবার আহ্লাদে
খেয়াল মতো কাজ ক'রে যাই, কষ্ট পাই কি সাধে ?
সোজাসুজি যা হয় বুঝি, হায় অদৃষ্ট চক্র !
আমার কথা বোঝেনা কেউ, পৃথিবীটাই বক্র ॥

সুকান্ত তার ভেজাল' নামক ছড়ায় বর্তমান দিনের চেহারাটা তুলে ধরেছে—

ভেজাল, ভোজল, ভেজাল রে ভাই, ভেজাল সারা দেশটায়,
ভেজাল ছাড়া খাঁটি জিনিস মিলবে নাকো চেষ্টায়।

ভেজাল তেল আর ভেজাল চাল, ভেজাল ঘি আর ময়দা,
'কোন ছোড়ে গা ভেজাল ভেইয়া, ভেজালসে হ্যায় ফয়দা।'
ভেজাল পোষাক, ভেজাল খাবার, ভেজাল লোকের ভাবনা,
ভেজালেরই রাজত্ব এ পাটনা থেকে পাবনা।
ভেজাল কথা—বাংলাতে ইংরেজী ভেজাল চলছে,
ভেজাল দেওয়া সত্যি কথা লোকেরা আজ বলছে।
'খাঁটি জিনিস' এই কথাটা রেখোনা আর চিত্তে,
'ভেজাল' নামটা খাঁটি কেবল আর সকলই মিথ্যে।
কলিতে ভাই 'ভেজাল' সত্য ভেজাল ছাড়া গতি নেই,
ছড়াটাতেও ভেজাল দিলাম ভেজাল দিলে ক্ষতি নেই॥

তখন ছিল অখণ্ড বাংলা। বৃটিশ দাপটের প্রতাপে দেশ ও জাতির মর্মন্তুদ অবস্থা। কিশোর কবি সুকান্তর মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। কিছুতেই অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করতে পারল না সে। তার লেখনী অসির মত হয়ে উঠল ক্ষুরধার—তার 'কলম' কবিতায় সে লিখল—

মজুর দেখনি তুমি? হে কলম, দেখনি বেকার?
বিদ্রোহ দেখনি তুমি? রক্তে কিছু পাওনি শেখার?
... ...
দিন নেই, রাত্রি নেই, শ্রান্তিহীন, নেই কোনো ছুটি
একটু অবাধ্য হলে তখনি ভ্রূকুটি ;
এমনি করেই কাটে দুর্ভাগা তোমার বারো মাস,
কয়েকটি পয়সায় কেনা হে কলম, তুমি ক্রীতদাস।
তাই যত লেখো, তত পরিশ্রম এসে হয় জড়ো ;
—কলম! বিদ্রোহ আজ. দল বেঁধে ধর্মঘট করো

লেখক স্তম্ভিত হোক, কেরানীরা ছেড়ে দিক হাঁফ
মহাজনী বন্ধ হোক মজুতের পাপ।
... ...
আর কালো কালি নয়, রক্তে আজ ইতিহাস লিখে
দেওয়ালে দেওয়ালে এঁটে, হে কলম আনো দিকে দিকে।

আরো অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা রয়েছে তার। বড় হয়ে তোমরা পড়বে।

মাটির মানুষের সঙ্গে ছিল তার একান্ত ভাব। মজুর কৃষাণের বঞ্চনার বেদনাই তাকে মুখর করে তুলেছিল। তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপিত হয়েছিল সুকান্তর। যে কবির জন্য অধীর আগ্রহে কান পেতে ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ—সুকান্ত সেই কবি। শ্রমিক, কৃষাণ, মধ্যবিত্তের আপনজন।

ব্যাডমিণ্টন আর দাবা ছিল সুকান্তর প্রিয় খেলা। মানুষের উপকার করবার ঝোঁক ছিল ছোটবেলা থেকেই। এ জন্যে সে নিজের মত একটি দল তৈরী করে নিয়েছিল। কথায় ও কাজে ছিল সে একটি মানুষ। অনেক, অনেক কবিতা লেখার মধ্যেই চলত তার নানা ধরণের বই পড়া।

ছোট থাকতেই মা মারা গেলেন ক্যান্সার রোগে। মাতৃহারা ছেলে। চোখের জল আর বুকের বেদনা নিয়ে একা একা কতদিন কাটিয়ে দিয়েছে নিভৃতে। মাঝে মাঝে হাঁফিয়ে উঠত সে। হারিয়ে যেতে চাইত অজানার মধ্যে। নিরুদ্দেশের পথে।

আজ এপার ওপার দুই বাঙলা জুড়ে তার খ্যাতি। দ্বিখণ্ডিত ভারতের দূর্ববঙ্গের ঘরে ঘরে এককালে সুকান্তর কিবিতা হাতে লিখে

প্রচারিত হয়েছে। এই কবিতার মধ্য থেকে তারা পেয়েছে অন্যায় আরে শোষণের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি।

অতি অল্প দিনের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছিল তার কবিখ্যাতি। ছোট সে বয়সে, কিন্তু ছোট্ট মানুষের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল অরণ্যের সঙ্গীত। সমুদ্রের বিক্ষোভ। কি-বা হয়েছিল বয়স? মাত্র তো একুশ। এই একুশ বছরের ছেলের হাতে যে কি যাদু ছিল, তা তোমরা বড় হয়ে জানবে। সুকান্ত তার সৃষ্টির মধ্যে চিরকাল বেঁচে থাকবে।

অসময়ে কঠিন রোগ রাহুর মত গ্রাস করল তাকে। দেহের রক্ত-গুলো উঠল বিদ্রোহী হয়ে। পঞ্জরে পঞ্জরে ঘুণ ধরিয়ে দিল। ডাক্তার এসে বললেন—টি, বি।—পরিজনদের চোখ বড় হয়ে গেল চিন্তায়। দেশবাসী ফেলল দীর্ঘশ্বাস। সুকান্তও মনের দিক থেকে হয়ে গেল অনেকটা একা। বাঁচতে সে চেয়েছিল, কিন্তু বাঁচতে সে পারেনি। তার অভাব তাকে বাঁচতে দেয়নি। তাই মাত্র একুশ বছর বয়েসে বাংলার কিশোর কবি দেহত্যাগ করল। ২৯শে বৈশাখ ১৩৫৪ সালে বঙ্গ সাহিত্যের একটি দীপ্ত উজ্জ্বল ভবিষ্যত সাহসা গেল নির্বাপিত হয়ে। সেদিনের বিপ্লবী ভারত থেকে সরে গেল একজন দিশারী।

অনুশীলনী

১। সুকান্ত কোন সালে কোথায় জন্মেছিলেন? তাঁর বাবা মার নাম কি? তাদের বাড়ীতে কিসের চর্চা হোতো?

২। সুকান্তরা কোথায় থাকতেন? তাঁদের আর্থিক অবস্থা কি রকম ছিল? তাঁর "অতি কিশোরের ছড়া"র চার লাইন বল।

৩। তাঁর "ভেজাল" এবং "কলম" কবিতার চার লাইন বল।

৪। তাঁর প্রিয় খেলা কি ছিল? তাঁর মা কি রোগে মারা গিয়েছিলেন? তিনি কি রোগে কোন সালে মারা গেলেন?

———